A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

আবুল মনসুর আহমদের
ব্যঙ্গ রচনা

রাজীব হুমায়ুন

আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গরচনা

রাজীব হুমায়ুন

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৯২
জুন ১৯৮৫

বা/এ : ১৬৬৫
পাণ্ডুলিপি : গবেষণা উপ-বিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা-সংকলন-ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণে
মানিক লাল শর্মা
মনোরম মুদ্রায়ণ
২৪ শ্রীশদাস লেন
ঢাকা-১

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ মোহসীন

মূল্য : পঁচিশ টাকা

ABUL MANSUR AHAMADER BANGARACHANA By Dr. Rajib Humayun, Assistt. Professor, i, Jahangirnagar University, Dhaka, Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Edition : June 1985, Price : Taka 25.00, US dollar 3.

উৎসর্গ

ডক্টর আবুল কাশেম চৌধুরীকে

যিনি আমার চলার পথ প্রশস্ততর করেছেন।

প্রসঙ্গত

বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত আবুল মনসুর আহমদের সার্বিক মূল্যায়ন, 'আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গরচনা' গ্রন্থে করা হয়নি।

প্রফেসর রফিকুল ইসলাম ও প্রফেসর সৈয়দ আকরম হোসেন গ্রন্থ-রচনায় আমাকে নিরন্তর অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন। প্রফেসর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের বিভিন্ন পরামর্শ আমার গ্রন্থের মানোন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর পরামর্শে পরিশিষ্ট অংশ সংযোজিত হল। পরিশিষ্ট সহ অন্যান্য সকল অংশের সীমাবদ্ধতা আমার নিজস্ব।

গ্রন্থের নির্ঘণ্ট তৈরী ক'রে দেয়ার জন্য আমি তরুণ গবেষক-প্রাবন্ধিক জনাব রফিকউল্লাহ খানকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এ'গ্রন্থ বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশ করার জন্য আমি বাংলা একাডেমীর গবেষণা-সংকলন-প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খানকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাংলা বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজীব হুমায়ুন

বিষয়সূচী

ভূমিকা ।। ১

রাজনৈতিক ব্যঙ্গ ।। ৫

ইংরেজদের ভেদনীতি ও ভেদনীতির শিকার ।। ৫
তথাকথিত বিদ্রোহী ।। ১০
দেশসেবার নামে আত্মসেবা ও রাজনৈতিক ভণ্ডামি ।। ১২
নির্বাচন প্রহসন ও ভোটরঙ্গ ।। ১৭
বিদেশী শাসনপ্রীতি ও খেতাবের মোহ ।। ১৯

অর্থনৈতিক ব্যঙ্গ ।। ২২

১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ ।। ২২
লবণ সংকট ।। ২৮
বিশ্বযুদ্ধ ।। ৩০
'ট্যাকসের গান গাই' ।। ৩১

ধর্মীয় ব্যঙ্গ ।। ৩৩

দাঙ্গা ।। ৩৩
একই ধর্মে কলহ ও ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ধর্মীয় দলাদলি ।। ৩৮
রক্ষণশীলতা ও নিয়মপালনে বাড়াবাড়ি ।। ৪৩
ধর্ম ব্যবসায় ।। ৪৮

গালিভরের সফরনামা ও 'আদুভাই' প্রসঙ্গ ।। ৫৭

গালিভরের সফরনামা ।। ৫৭
আদু ভাই ।। ৬৩

মনসুরের শিল্পকৌশল, মানস ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গ ।। ৬৫

তথ্যনির্দেশ ।। ৭৭

পরিশিষ্ট ।।

আবুল মনসুর আহমদের জীবন ও সাহিত্যের
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ।। ৮৯
বাঙলার শ্রেষ্ঠ রস-সাহিত্যের
একটি খসড়া ।। ৯৯

সহায়ক রচনা-পঞ্জী ।। ১০২

নির্ঘণ্ট ।। ১০৫

ভূমিকা

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮—১৯৭৯) একাধারে রাজনীতি, আইন ব্যবসা, সাংবাদিকতা ও সাহিত্যসেবা করেছেন। তাঁর চারটি পরিচয়ের মধ্যে সাহিত্যিক পরিচয় সবচাইতে বড় বলে স্বীকৃত। সাহিত্যিক পরিচয়ের মধ্যে ব্যঙ্গরচনার স্রষ্টা হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত।

উপন্যাস, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গরচনা, ধর্মভিত্তিক গ্রন্থ এবং শিশু-কিশোরোপযোগী গ্রন্থসমূহ মিলে আবুল মনসুর আহমদ বিশখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আঠারটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অপ্রকাশিত গ্রন্থ দুটো হচ্ছে মা-খাকী (উপন্যাস) ও তিতুমীর। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে End of a betrayal and restoration of Lahore resolution (১৯৭৪) ইংরেজী ভাষায় লিখিত। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আয়না (১৯৩৫), ফুডকনফারেন্স (১৯৪৪), গালিভরের সফরনামা (১৯৫৬) ও আসমানী পর্দা (১৯৫৭) ব্যঙ্গরচনার সমষ্টি; সত্য-মিথ্যা (১৯৫৩) জীবনক্ষুধা (১৯৫৬) ও আবেহায়াত (১৯৬৯) উপন্যাস; পাক বাঙলার কালচার (বাঙলাদেশের কালচার)—১৯৬৬; শেরে বাঙলা হইতে বঙ্গবন্ধু (১৯৭৩) এবং বেশীদামে কেনা কমদামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা (১৯৮২) প্রবন্ধ সংকলন; আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৮) ও আত্মকথা (১৯৭৮) স্মৃতিচারণ মূলক গ্রন্থ; মুসলমানী কথা (১৯২৪), নয়াপড়া (১৯৩৪) ও ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া (১৯৫২) শিশু-কিশোরোপযোগী গ্রন্থ, আল-কোরআনের নসিহত (১৯৭৫) অনুবাদ গ্রন্থ। এ'ছাড়া রয়েছে যৌনবিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থ পরিবার পরিকল্পনা (১৯৬৭)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আবুল হাসনাত সাহেবের সুবিখ্যাত 'যৌনবিজ্ঞান' গ্রন্থ-রচনায় তাঁর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে ব'লে আবুল মনসুর আহমদ দাবী করেছেন।[১]

উপন্যাস, ব্যঙ্গ-রচনার সংকলন, প্রবন্ধ সংকলন ও স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থসমূহ ছাড়া বাকীগুলো ঠিক সাহিত্য পদবাচ্য নয়। তাঁর প্রবন্ধসমূহ মৌলিক চিন্তার পরিচয়বাহী। মূলতঃ সমাজসচেতন ব্যঙ্গরচনার স্রষ্টা হিসেবে তিনি বাঙলা সাহিত্যে অতুলনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

আবুল মনসুর আহমদের রচনাসমূহ বিশেষ করে ব্যঙ্গরচনাবলী ব্যাপক-ভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হবার দাবী রাখে। উনিশ শ' বিশের দশকে খ্যাতিলাভ করলেও আজ পর্যন্ত আবুল মনসুর আহমদের ওপর কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়নি। তাঁর কথাসাহিত্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে নুরুল আমিনের আলোচনা গ্রন্থ 'আবুল মনসুর আহমদের কথা সাহিত্য' (১৯৮৪)। এ'ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য,

১৯৬০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ডক্টর অজিত কুমার ঘোষের গবেষণা গ্রন্থ 'বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা'। এ গ্রন্থে চর্যাপদ থেকে শুরু করে পঞ্চাশের দশকের অনেক লেখক আলোচিত হলেও আবুল মনসুর আহমদ আলোচিত হননি। বাঙলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গস্রষ্টার প্রতি অবহেলার মূলে অজ্ঞতা নাকি অন্য কিছু কাজ করেছে তা' বলা কঠিন।

আয়না, ফুডকনফারেন্স, গালিভরের সফরনামা ও আসমানী পর্দা গ্রন্থের অধিকাংশ রচনাই ব্যঙ্গগল্প; বাকীগুলো ব্যঙ্গ নাটিকা ও প্যারডি-ব্যঙ্গ। ব্যঙ্গগল্প ব্যঙ্গনাটিকা ও প্যারডি ব্যঙ্গ মিলে চারটি গ্রন্থে ৩৭টি ব্যঙ্গ রচনা রয়েছে। তাঁর প্রথম ব্যঙ্গরচনা 'ছহি বড় তৈয়বনামা' মশহুর পুঁথি 'ছহি বড় সোনাভানে'র অনুকরণে লিখিত হয়েছিল। লেখকের রাজনৈতিক সহকর্মী খেলাফত নেতা মৌলবী তৈয়ব উদ্দীন আহমদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ-দলের একজন আইন পরিষদ সদস্য ছিলেন। মৌলবী তৈয়ব, স্যার আবদুল করিম গজনবীর অনুরোধে সরকার পক্ষে একটি ভোট দিয়ে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছিলেন। তাঁর এই কাজের নিন্দায় লেখক এ প্যারডি-ব্যঙ্গ লিখেছিলেন।[৩] প্রথম রচনাটি কোন গ্রন্থভুক্ত হয়নি।

চারটি গ্রন্থে সংকলিত ব্যঙ্গরচনাসমূহ ১৯২২ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে লিখিত এবং 'সওগাত' ও অন্যান্য পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এদের মধ্যে 'ট্যাকশের গান গাই' (আসমানী পর্দা) প্যারডিটি ১৯৬৫ সাল রচিত হয়েছিল। আসমানী পর্দার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। প্যারডিটি নিশ্চয় পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যঙ্গ রচনা সংকলনেরই একাধিক সংস্করণ রয়েছে। 'আয়না'র সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে। কোন গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ রচনাসমূহের জনপ্রিয়তা এবং স্বার্থকতার অন্যতম মাপকাঠি। বলাবাহুল্য, রচনাসমূহ পত্রিকায় প্রকাশের সাথে সাথে পাঠককুলের প্রশংসাধন্য হয়। 'ফুডকনফারেন্স' প্রসঙ্গে অন্নদাশংকর রায় লিখেছিলেন 'আয়না' লিখিয়া আবুল মনসুর আহমদ প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছিলেন। ফুডকনফারেন্স লিখিয়া তিনি অমর হইলেন'।[৩] আয়নার ফ্রেম বেঁধেছিলেন নজরুল ইসলাম এবং ফুডকনফারেন্স উদ্বোধন করেছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। 'আয়নার ফ্রেম' বাঁধতে গিয়ে অর্থাৎ মুখবন্ধ রচনা করতে গিয়ে নজরুল লিখেছিলেন 'যে সমস্ত মানুষ হরেক রকমের মুখোশ পরে আমাদের সমাজে অবাধে বিচরণ করছে, আবুল মনসুরের আয়নার ভেতরে তাদের স্বরূপমূর্তি বন্য ভীষণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। মানুষের মুখোসপরা এই বহুরূপী বন মানুষগুলোর সবাইকে মন্দিরে, মসজিদে, বক্তৃতার মঞ্চে, পলিটিক্সের আখড়ায়, সাহিত্য সমাজে, যেন বহুবার দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।[৪] বলাবাহুল্য, আয়নার ফ্রেমটি বড় মযবুত হয়েছিল। ফ্রেমটি এখনও

অটুট রয়েছে। ভেতরের 'আয়নায়'ও বিলকুল মরচে পড়েনি এবং মুখগুলো আগের মতই রয়েছে।

'আয়না' উৎসর্গিত হয়েছিল আবুল কালাম শামসুদ্দীনের করকমলে। উৎসর্গপত্রে লেখক 'হাসির পেছনে কান্না' লুকানো আছে বলে[৫] দাবী করেন। ফুডকনফারেন্স উৎসর্গিত হয়েছিল আয়নুল হক খাঁকে। উৎসর্গপত্রে বক্তব্য ছিল "দুনিয়ার ফুডকনফারেন্সে ভিযিটার্স গ্যালারিতেই তোমার আমার বরাবরের পরিচয়। ভিযিটার্স গ্যালারী থেকে সট্‌কে তুমি ডেলিগেট্‌স এনক্লোযারে ঢুকে না পড়, তারই জন্য তোমার গলায় ভিযিটার্স টিকিটের এই মালা ঝুলিয়ে দিলাম।[৬] গালিভরের সফরনামা ব্রেইন অপারেশনের উস্তাদ[৭] জর্জ বার্ণার্ডশ স্মরণে উৎসর্গিত। উৎসর্গপত্রের বক্তব্যসমূহ বিশেষ করে শেষোক্ত গ্রন্থের নামকরণ প্রণিধানযোগ্য।

১৯২২ থেকে ১৯৫৪ সাল কাল পরিধিতে অর্থাৎ বত্রিশ বছরে রচিত সাইত্রিশটি ব্যঙ্গ রচনার মধ্যে গল্পের সংখ্যা আটাশ। বাকী নয়টির মধ্যে চারটি নাট্যচিত্র, তিনটি প্যারডি-ব্যঙ্গ এবং বাকী দুটো নতুন রীতিতে রচিত ব্যঙ্গ রচনা। কয়েকটি রচনায় রূপকের আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন—'অথ কুত্তাশিয়াল চরিতামৃত', 'ফুডকনফারেন্স,' 'গোদেওতাকাদেশ' ও 'ধর্মরাজ্য'। তিনটি প্যারডির মধ্যে দুটো—'ট্যাকশের গান গাই' ও 'আয় ভেস্তে কে যাবি আয়' যথাক্রমে নজরুল ইসলামের নারী ও 'আয় বেহেস্তে কে যাবি আয়' অবলম্বনে রচিত। তৃতীয় প্যারডি 'ছহি বড় ওযারতনামা 'ছহি বড় সোনাভানের অনুকরণে রচিত। শেষোক্ত লেখাটি প্যারডি-ব্যঙ্গ পর্যায়ের। পড়তে গেলে প্রথমে পাশ্চাত্য সাহিত্যের 'মক-হিরোইকে'র মতো মনে হতে পারে তবে লেখাটি ঠিক সে পর্যায়ে পড়ে না।

১৯২২ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশের রাজনীতি, ধর্ম এবং অর্থনীতি ক্ষেত্রে বহু ঘটনা ও বহু আন্দোলন ঘটেছে। ব্যাপক অর্থে রাজনীতি ক্ষেত্রে চলছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন; ধর্মীয় ক্ষেত্রে চলছিল একদিকে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ, অন্যদিকে একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় কলহ; অর্থনীতি ক্ষেত্রে চলছিল ধণিক-জমিদারদের শোষণ, দুর্ভিক্ষ, পণ্যাভাব ইত্যাদি। সাধারণ জনগণ ঘটনার উপরিভাগ দেখেন আর একজন সচেতন নাগরিক, একজন লেখক এবং বিশেষ ক'রে একজন ব্যঙ্গকার দেখেন উপরিভাগের নীচের ঘটনা, অন্তরালের ঘটনা। রাজনৈতিক-সাংবাদিক-উকিল আবুল মনসুর আহমদ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অন্তরালের ঘটনাসমূহকে তাঁর ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি দেখেছিলেন হিন্দু-মুসলিম নেতৃত্বে কোন্দল-অনৈক্য চক্রান্ত। 'অথ কুত্তাশিয়াল চরিতামৃত,' 'ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি,' 'ত্রিযুগমিতি,' 'ছহি বড় ওযারতনামা' প্রভৃতি ব্যঙ্গ রচনায় তিনি তাদের এঁকেছেন। তিনি দেখেছিলেন তথাকথিত

বিদ্রোহীদের, দেশসেবাব নামে তথাকথিত দেশসেবকদের অপচেষ্টা; নির্বাচন প্রহসন; দেখেছিলেন গদির প্রতি লোভ; ইংরেজপ্রীতি, ইংরেজপ্রদত্ত খেতাবের মোহ এবং স্বার্থান্বেষী মুখ রাজনীতিকদের। এদেশের রাজনীতির অঙ্গনে এরা সবাই চেনা মুখ। সেই চেনামুখদের সাহিত্যের পাতায় এনে ব্যঙ্গের চাবুক হেনেছেন 'বিদ্রোহী সংঘ', 'জনসেবা ইউনিভার্সিটি', 'এ আই সি সি,' 'জমিদারি উচ্ছেদ', 'আহা যদি প্রধান মন্ত্রী হতে পারতাম', 'চেঞ্জঅব হার্ট,' 'বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে', 'ইলেকশন,' 'অনারেবল মিনিষ্টার,' 'ফুডকনফারেন্স,' 'মর্ডাণ ইব্রাহীম,' 'গালিভরের সফরনামা' প্রভৃতি ব্যঙ্গ রচনায়। ধর্মের ক্ষেত্রে লেখক দেখেছিলেন ধর্মের নামে বিবিধ গোঁড়ামি—হিন্দু-মুসলিম বিবাদ, একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় খুঁটিনাটি নিয়ে দ্বিমত ও কলহ, রক্ষণশীলতা, ধর্মব্যবসায়, ভণ্ডপীরদের কীর্তিকলাপ। 'গো দেওতা কা দেশ,' 'ধর্মরাজ্য,' 'নায়েবেনবী' লীড্‌রে কওম,' 'মুজাহেদীন,' আসমানী পর্দা, 'শিক্ষা সংস্কার' 'খাজাবাবা' ও হুজুর কেবলা রচনায় তাদের সাক্ষাৎ মেলে।' ২২ থেকে ৫৪ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময় ঘটেছে দুর্ভিক্ষ, বিভিন্ন পণ্যাভাব। এ দুর্ভিক্ষ এবং পণ্যাভাবের পেছনে দায়ী ছিল বিবিধ রাজনীতিক এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিস্বার্থ ও কারসাজি। শুধু খাদ্যের দুর্ভিক্ষ নয়, চলছিল চেতনার ও মূল্যবোধের দুর্ভিক্ষ। সেই চেতনার দুর্ভিক্ষের নিপুণ চিত্র ফুডকনফারেন্স', গ্রো মোর ফুড,' লঙ্গরখানা, সায়েন্টিফিক বিযিনেস, 'রিলিফ ওয়ার্ক,' মিছিল প্রভৃতি রচনা।

কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়ে অথবা আক্রমণ ক'রে আবুল মনসুর আহমদ ব্যঙ্গ রচনা লেখেননি। ফলে তার রচনায় লেম্পুন, ইনভেকটিভ অথবা কুৎসা কাহিনীর ঠাঁই নেই। ব্যঙ্গ সাহিত্যে এটি প্রায় দুর্লভ বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত-ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সাহিত্যে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা তিনি করেননি। তাঁর আঁকা প্রায় প্রতিটি চরিত্র তাদের নিজস্ব সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে। একটি মাত্র চরিত্র কোন নির্দিষ্ট সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করে না বলা যায়। সেই ব্যতিক্রমী চরিত্রটি হল ব্যর্থ অথচ সকলের প্রিয় 'আদু ভাই'। 'আদু ভাই' রস রচনার পর্যায়ে পড়ে। ব্যঙ্গ সাহিত্যের বৈচিত্র্য বিচার করে সাধারণতঃ রাজনৈতিক ব্যঙ্গ, নৈতিক ব্যঙ্গ, সাহিত্যিক ব্যঙ্গ ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। আবুল মনসুর আহমদে সাহিত্যিক ব্যঙ্গ নেই বললে চলে। জোনাথন সুইফটের গালিভার্স ট্রাভেলস এর চতুর্থ পর্বকে নৈতিক ব্যঙ্গের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়। পুরোপুরি এ-জাতীয় রচনাও আবুল মনসুর বেশী সৃষ্টি করেননি। তবে তাঁর গালিভরের সফরনামাকে এ পর্যায়ে ফেলা যায়। আবুল মনসুরের ব্যঙ্গ রচনাকে ব্যাপক অর্থে তিনভাগে ভাগ করা চলে—১. রাজনৈতিক ব্যঙ্গ ২. অর্থনৈতিক ব্যঙ্গ ও ৩. ধর্মীয় ব্যঙ্গ।

রাজনৈতিক ব্যঙ্গ

ইংরেজদের ভেদনীতি ও ভেদনীতির শিকার

ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বশর্ত ছিল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে লীগ কংগ্রেস মৈত্রী (১৯১৬) পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মিলিতভাবে মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান (১৯১৮), ১৯২০-এর খেলাফত আন্দোলন, ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বেঙ্গল প্যাক্ট হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিল বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু গোড়া থেকেই বিভিন্ন আন্দোলন প্রচেষ্টায় ফাটল ধরাবার কাজে নিয়োজিত ছিল ইংরেজদের divide and rule policy. বলা হয়ে থাকে ইংরেজদের ভেদনীতি শুরু হয়েছিল আসলে ১৮৭০ এর পর থেকে। বিভিন্ন সময় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মাত্র। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গে মুসলমানদের উপকার করা ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল না—উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে নিজেদের শাসন শোষণের পথ অবারিত করা—বিপ্লবী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। ফলস্বরূপ দেখা গেল, ১৯০৫—১৯০৬ সালের বিপ্লবী বাহিনী গঠিত হল মূলতঃ হিন্দু মধ্যবিত্ত থেকে। বস্তুতঃ তৎকালে বিপ্লবীরা মুসলিম বিরোধী ছিলেন। কেননা, হিন্দু বিপ্লবীরা দেখেছিলেন বৃটিশেরা মুসলমানদের ব্যবহার করছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে। আর মুসলমানরাও জড়িয়ে পড়েছিলেন সরকারের দাবার চালে।[৮] অন্যদিকে "ভারতীয় বুর্জোয়ার চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য তারা ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরী ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল ছিলো—এই নির্ভরশীলতার ফলেই অগ্রসর হিন্দু-বুর্জোয়া এবং অনগ্রসর মুসলিম বুর্জোয়া উভয়েই অল্প-বিস্তর ইংরেজ বিরোধী হলেও সেই বিরোধিতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটা সর্বাত্মক বিপ্লবী চরিত্র পরিগ্রহ করতে পারেনি। উপরন্তু হিন্দু মুসলমান বুর্জোয়ার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দান করে পরিস্থিতিকে আরও অনেক বেশী জটিল করে তুলেছিলো।.....এই বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা গেলো সেটাও ইংরেজদের সহযোগিতায় ক্রমশঃ দানা বাঁধতে থাকলো।[৯] অবশেষে মুসলমানরা ব্যস্ত হলো দ্বিজাতিতত্ত্ব নিয়ে আর হিন্দুরা ব্যস্ত হল 'অখণ্ড ভারত' নিয়ে। ইংরেজদের কাজ ছিল অদূরে ব'সে মুচকি হেসে ইন্ধন যোগানো।

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর কয়েকটি রচনায় যুগপৎ ভেদনীতির ইন্ধনদাতা এবং তাদের শিকার হিন্দু-মুসলমানদের ব্যঙ্গ করেছেন। প্রথমেই আলোচনা করা যাক, গালিভরের সফরনামা গ্রন্থের 'অথ কুত্তা শিয়াল চরিতামৃত' নাট্য চিত্রটি। সুন্দরবনের রাজা রয়েলবেঙ্গল টাইগার গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে অবগত হলেন—তার সাম্রাজ্যের কুত্তা ও শিয়াল সম্প্রদায় স্বাধীনতা চাচ্ছে। তিনি চিন্তিত। জানা গেল, কুত্তা ও শিয়াল সম্প্রদায় বহুযুগের বিরোধ-কলহ ভুলে ঐক্যবদ্ধ। "অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী করিয়া, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না করিলে সার্বজনীন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া এবং এই সমস্ত দাবী দাওয়া রাজার নিকট পেশ করিবার জন্য শক্তিশালী প্রতিনিধিদল গঠন করিয়া, সর্বশেষে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন প্রস্তাবাদি মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত হইল। .....রাজতন্ত্রের অবসানের আর বিলম্ব নাই, পর্যবেক্ষক মহলের নিকট তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল।"[১০] অন্যদিকে সুন্দরবন রাজের গোপন মন্ত্রণাকক্ষে বানরের পরামর্শে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল কুত্তা ও শিয়াল সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে রাজদরবারে নিমন্ত্রণের। নিমন্ত্রিত কুত্তাদের জানানো হলো, তারাই দেশশাসনের উপযুক্ত। তবে কুণ্ডলীকৃত বাঁকালেজে তাদের ত্রুটি রয়েছে। ত্রুটি সংশোধন করতে চাইলে গাভিন শিয়ালনী ও সদ্য বিয়ান বাচ্চা-শিয়ালের চর্বি[১১] ব্যবহার করতে হবে। কুত্তারা খুশী হয়ে চলে গেল। সেইদিন সন্ধ্যেবেলা শিয়ালেরা এলে তাদের কাছে কিন্তু কুত্তাদের লেজের প্রশংসা করা হল এবং দৌড়াবার কালে—শিয়ালদের লম্বা লেজের ত্রুটির কথা বলা হল। শেষে লেজকে কুণ্ডলীকৃত করবার সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত হবার জন্য উপদেশ দেয়া হল। এবং বলা হল 'কুত্তার সদ্যজাত শাবকের চর্বি নিজ নিজ লেজে মাখিবে এবং সূর্যোদয়ের প্রথম কিরণে চন্দন কাঠের ধুঁয়ার শেঁক দিবে[১২]। সেই থেকে কুত্তারা লেজ সোজা করবার এবং শিয়ালরা লেজ কুণ্ডলী করবার সাধনা করছে। আন্দোলন বন্ধ আছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনে নির্বিবাদে রাজত্ব করছে।[১৩]

অথ কুত্তাশিয়াল চরিতামৃত একটি রূপক নাট্যচিত্র—Beast-fable কাহিনী ধারায় নির্মিত। রয়েল বেঙ্গল টাইগার বিদেশী ইংরেজ। কুত্তাশিয়ালের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামরত হিন্দু মুসলমানের চরিত্র বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি থেকে ইংরেজ এবং হিন্দু মুসলমানদের চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না। যেমন সুন্দরবন রাজকে "কেহ কেহ দেশে গ্রাজুয়েল রিয়েলিযেশন অব সেল্ফ গবর্ণমেন্টের আশ্বাস দিয়া নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করিবার পরামর্শ দিলেন।"[১৪] তাছাড়া অন্যত্র ব্যবহৃত 'স্বরাজ

স্বাধীনতা,' 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন,' 'রাজার শাসন মানব না' 'সার্বজনীন আইন অমান্য আন্দোলন, ইত্যাকার শব্দসমষ্টি তৎকালীন রাজনৈতিক অঙ্গনের পরিবেশ নির্মাণ করে। পটভূমি আলোচনা প্রসঙ্গে ভেদনীতির কথা উত্থাপিত হয়েছিল। নাট্যচিত্রের একটি চরিত্র শিব, পণ্ডিত এক জায়গায় বলে "আমরা ধর্ম সাক্ষী করিয়া সারমেয় সম্প্রদায়ের সহিত প্যাক্ট করিয়াছি। আপনার এই ভেদনীতি, ডিভাইড এ্যান্ড রুল, আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরাইতে পারিবে না।"[১৫] "শিব, পণ্ডিতের প্যাক্ট এবং ডিভাইড এন্ড রুল" উক্তি সমূহ—লক্ষ্ণৌ-প্যাক্ট, বেঙ্গল-প্যাক্ট, ইংরেজদের ভেদনীতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

নাট্যচিত্রের বহু স্থানে ভেদনীতির শিকার হিন্দু-মুসলমানের ওপর ব্যঙ্গ-বাণ নিক্ষিপ্ত। জনৈক কুত্তা একবার বাঘকে বলেছিল—"হে আমাদের পরম হিতৈষী রাজা বাহাদুর, আপনি আদেশ করুন, আমাদের কোন সামান্য ত্রুটির দরুন শিবা সম্প্রদায় আমাদের হাত হ'তে দেশের নেতৃত্ব কাড়িয়া নিতে পারে?[১৬] অন্যদিকে শিবা বলেছিল, "তাহা হইলে হে পরম ভক্তিভাজন মাতুল ঠাকুর, আমরা এখন কি করিব?[১৭] বাঘের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে গিয়ে কুত্তা এবং শিয়ালরা বাঘেরই অনুগ্রহ প্রার্থী হল এবং নিজেদের নিয়োগ করল পরস্পরের নিধনযজ্ঞে। আন্দোলন কোন অবস্থায়? আন্দোলন বন্ধ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনে নির্বিবাদে রাজত্ব করছে। মাওলানা আযাদ বলেছিলেন, বৃটিশরা মুসলিমদের হাতের ক্রীড়নক বানিয়েছিল। আসলে বৃটিশরা খেলাচ্ছিল দুপক্ষকেই। আত্মঘাতী আনাড়ী খেলোয়াড়দের নিপুণ ব্যঙ্গচিত্র অথ কুত্তা-শিয়াল চরিতামৃত।

ব্যঙ্গ রচনার অন্যতম প্রধান উপাদান কৌতুক। আবুল মনসুর আহমদের যে কোন ব্যঙ্গ রচনাতেই কৌতুক উপাদান সুলভ। 'অথ কুত্তা-শিয়াল চরিতামৃত থেকে কয়েকটি উদাহরণ নেয়া যাক—

১. 'কুত্তা-শিয়াল ভাই-ভাই', 'সুন্দরবনের মুক্তি চাই', বাঘের জুলুম চলবে না, 'রাজার শাসন মানব না' ইত্যাদি ইত্যাদি শ্লোগানে সুন্দর বনের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত।[১৮]

২. বাঘা কুত্তা সভাপতির আসনে উপবিষ্ট। আসন মানে নিজের কুণ্ডলী-পাকানো লেজ।...আসমান ফাটাইয়া সভাপতি দুইটা আওয়াজ করিলেন ঃ ঘেউ ঘেউ। উহার ইংরেজী পার্লামেণ্টারি অর্থ ঃ অর্ডার অর্ডার।[১৯]

নাট্যচিত্রটি রচিত হয়েছিল ১৯৪২ সালে। বলাবাহুল্য, একই Beast fable ধারায়। জর্জ ওরওয়েলের পৃথিবী খ্যাত এনিম্যাল ফার্ম রচিত হয়েছিল আরো তিন বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে।

স্বাধীনতা-আন্দোলনে নেতৃবৃন্দের আত্মকলহ ও বিচ্ছিন্ন সংগ্রামের রূপক প্যারডি-ব্যঙ্গ 'ছহি বড় ওযারত নামা' '(১৯৪৩)। রচনাটি প্রচলিত পুঁথি ছহি বড় সোনাভানের প্যারডি। ওযারত বিবি যৌবনপ্রাপ্ত হলে তাকে লাভ করবার জন্য চার ভাই ফজু-নজু-রামা-সামা সিদ্ধান্ত নিল। চার ভাই মিলে মা বঙ্গবানুকে বোঝাল ওযারত বিবি এলে, ঘরে সুখ-সমৃদ্ধি আসবে—

বসিবে সোনার পাটে শুইবে রূপার খাটে
পোলাও খাইবে দিন-রাত।[২০]

কিন্তু কে আগে তাকে জয় করতে যাবে? এ' নিয়ে লড়াই শুরু হল। আম্মা কান্দে এ কেমন বিবাদ ঘরোয়া।[২১] অবশেষে আপোষ সিদ্ধান্ত অনুসারে যথাক্রমে ফজু-নজু-রামা-শামা ওযারত বিবিকি জয় করতে গিয়ে বিবির হাতে বন্দী ও নাজেহাল হল। বঙ্গবাবুর ক্লেশ গেল না।

প্যারডি-পুঁথির ওযারত বিবিকে মুক্ত বাঙলার মন্ত্রীত্ব হিসেবে ধরা যেতে পারে। একদিকে ফজু-নজু মুসলমানদের অন্যদিকে রামা-শামা হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করছে। বঙ্গবানু হচ্ছে বাঙলা এবং বাঙলার জনগণ। নজু-ফজু-রামা-শামা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করলে ওযারত বিবিকে লাভ করতে পারত। কিন্তু অনৈক্যের কারণে শুধু যে তারা মন্ত্রীত্ব/ক্ষমতা লাভে ব্যর্থ হল তা' নয়, ক্ষমতার অধিকারীর হাতে বন্দী হয়ে তারা ভেঁ ভেঁ করছে। বাঙলার জনগণের দুঃখ গেল না, মন্ত্রীত্ব/ক্ষমতা লাভ প্রয়োজন ছিল সকল ভাইয়ের অথচ তারা বিবাদ করল বয়সে বড়-ছোট নিয়ে—আগে পরের ব্যাপার নিয়ে—

"ফযু বলে এ'বড় অন্যায়
আমি বড় সবাকার আমি আগে হকদার
মুই আগে ভজিব কন্যায়।"[২২]

ভাইয়ে-ভাইয়ের বিবাদে কি লাভ হল?

ফজু মিয়ার লুঙ্গি গেল নজুর পায়জামা,
রামা-শামার গামছা গেল নাহিক গায় জামা।
তবু না লড়াই থামে কান্দে বেসরোয়া,
আম্মা কান্দে এ কেমন বিবাদ ঘরোয়া।[২৩]

বন্দী হয়ে চার ভাই কি করছে? প্রত্যেককে আলাদাভাবে বিবির মুচকি হাসির প্রতীক্ষায় রয়েছে। বন্দী হবার পরও একাকী মন্ত্রীত্ব লাভের খায়েশ তাদের গেল না। মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী পুঁথির ফজু-নজু হচ্ছেন যথাক্রমে শেরে বাঙলা একে ফজলুল হক এবং খাজা নাযিমুদ্দীন।

সার্থক প্যারডি মানেই কৌতুকের ফোয়ারা। আবুল মনসুর আহমদ 'ছহি বড় ওযারত নামায়' চমৎকার রূপক সৃষ্টি ছাড়াও 'ছহি বড় সোনাভান' তথা বাংলার পুঁথি সাহিত্য ধারার ভাষা-ছন্দ ও রোমান্সমূলক উপাদানের সার্থক অনুকরণ ক'রে পাঠকদের প্রচুর কৌতুকরস পরিবেশন করেছেন। যেমন—

১. বার জংগ করে বিবি কেতাবে খবর
তের জংগ লেখা যায় কলিকার শহর।
চান্দের ছুরত বিবি বড়ই হাছিনা।[২৪]

২. ছুরত দেখিয়া দিল মজিল
বেশরা হালেতে তারে ভজিল[২৫]

৩. ওযারতের কথা শহদ সমান।
মনছুর ভনিছে শুন মুসলমান ॥[২৬]

৪. মায়ের শাড়ির পড়ে পিন্দে বাপের কোট
একপায়ে চটি পিন্দে আর পায়ে বুট।।[২৭]

৫. গাধায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল
ছয়দিনের রাহা মর্দ ছয় মাসে গেল।[২৮]

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এ'চার যুগের শেষ তিন যুগকে নিয়ে রচিত হয়েছে রূপক ও ব্যঙ্গ নাটিকা ত্রিযুগমিতি। লেখক নাটিকা না বলে বলেছেন 'নাটীকা' অর্থাৎ টীকা নয়। 'নাটীকা'টি অনেকটা 'অথ কুত্তাশিয়াল চরিতামৃতের মতই। ত্রেতাযুগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল মদনা ডাকাত এবং করিম চোরার ঐক্যের। কেননা, ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে তারা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করতে পারবে। স্বরাজ স্থাপন করতে পারবে। কিন্তু দ্বাপর যুগে ডাকাতদের আলাদা সংগ্রাম চলল। কলি যুগে হল চোর ডাকাতদের অন্তর্বিবাদ। বিবাদের এক পর্যায়ে ডাকাতরা উভয়ের শত্রু কাজীর সাথে নিজেদের আপোষের সংবাদ দিয়ে চোরদের ধমকাল। চোরেরা প্রত্যুত্তরে জানাল, তারা আগেই আপোষ করে ফেলেছে। আপোষের অন্যতম শর্ত ছিল পরস্পরকে কাযীর কাছে ধরিয়ে দেওয়া। নিজেদের চক্রান্তে এবং বিশ্বাসঘাতকতায় উভয় দলই কাজীর হাতে ধরা পড়ল। কাজীকে তজ্জতা প্রকাশ করলেন। "আর এমন অল্প পরিশ্রমে সমস্ত চোর এবং ডাকাতদের একত্রে গ্রেফতার করিতে পারিলাম যে ভ্রাতৃ-বিরোধের দৌলতে, সে ভ্রাতৃ-বিরোধ জিন্দাবাদ।"[২৯]

রূপক নাটিকার আগা গোড়া হিন্দু-মুসলমানদের অনৈক্য ও রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃবিরোধকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। মদনা ডাকাত মুসলিম লীগ, করিমচোরা হিন্দু আর কাজী ইংরেজদের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ব্যঙ্গের নিপুণ ব্যবহারে নাটিকাটি জমে উঠেছে।

"এই যে দুই দুইটা যুগ ধরিয়া চৌর্যবৃত্তির স্বরাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলাম, তাতে চোরেরা আমাদের সহ-সভাপতি ছাড়া আর উচ্চতর কোন সম্মান দিয়াছে? জাতীয় পতাকা বলিয়া ওরা যে নিশান চালাইয়া দিয়াছে, তাতে শুধু খন্তিমার্কা দেওয়া হইয়াছে কেন? আমাদের ডাকাতদের সঙ্গে খন্তির কি সম্পর্ক আছে?[৩০]

উদ্ধৃতির প্রথম অংশে কংগ্রেস এবং হিন্দুদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে। এক সময় কংগ্রেসে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানানো হতো। কিন্তু সাধারণতঃ কম ক্ষমতাসম্পন্ন সহ-সভাপতির পদ ছাড়া কার্যকরী পরিষদে বড় কোন পদ দেয়া হতো না। উদ্ধৃতির দ্বিতীয়াংশে বন্দে মাতরমকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে। 'বন্দে মাতরমকে অবিভক্ত ভারতের জাতীয় সঙ্গীত করবার চেষ্টা চলছিল। অথচ 'বন্দে মাতরমের বাণীতে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ঠাঁই ছিল না।

'ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি' (১৯৪৫) গল্পে অনৈক্যের বিষয়টি এসেছে সম্পূর্ণ নতুনভাবে। হিন্দু মুসলমান একতাবদ্ধ না হলে ইংরেজরা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না—একথা লেখক ভালভাবেই জানেন আর জানেন বলেই লেখকের মনে হয়েছে, গান্ধী-জিন্নাহ যেন ইচ্ছে করেই অনৈক্যের খেলা খেলছেন যাতে ইংরেজরা স্বাধীনতা গছিয়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে। "সম্মিলনীতে গিয়ে আপনি আর আমি মারামারি বাঁধাব। আমাদের টানাটানি ক'রে ছাড়াতেই বড়লাটের প্রাণান্ত হবে। স্বাধীনতা দেবার ফুরসত পাবে সে কোথায়।[৩১] এ গল্পে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেন উল্টো দিকে ফিরে। হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ফলে স্বাধীনতার আসল প্রশ্নটিই চাপা পড়ে যাচ্ছিল বারবার। তাছাড়া, নিজেদের মধ্যে অনৈক্য থাকলে স্বাধীনতা আসবে না—এ সহজ সত্যটি গান্ধী-জিন্নাহর না-বুঝবার কথা ছিল না। এ সহজ সত্যটি উপলব্ধি করার পরও যদি কেউ আত্মকলহে লিপ্ত থাকে তাহলে সে আত্মকলহকে ইচ্ছাকৃত ছাড়া আর কীই বা বলা যায়? এ গল্পে লেখকের ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হল তাদের পর যারা বুঝেও বুঝতে পারে না অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বুঝতে চায় না অনেক কিছু।

তথাকথিত বিদ্রোহী

সমাজে এক শ্রেণীর বিদ্রোহী আছে যাদের বিদ্রোহ পলায়নবাদের নামান্তর। রাজনৈতিক বিদ্রোহে ঝুঁকি আছে ব'লে তারা সামাজিক আচার অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বুলি কপচিয়ে দাম ও নাম বাড়াবার চেষ্টা করে। অথচ সেটা যে অধিকাংশ সময় গাঁ বাঁচাবার ফন্দী মাত্র—মুখোশ একটু উন্মোচন করলেই সহজে বোঝা যায়। তাছাড়া, একশ্রেণীর বিদ্রোহী আছে, যাদের

কাছে স্বাধীনতা, উচ্ছৃংখলতার নামান্তর। কিছু লোক ভাবত, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এলে কোন প্রচলিত নিয়ম কানুন মানতে হবে না—এমনকি ট্রাম-ট্রেনের ভাড়া পর্যন্ত দিতে হবে না। আবার কিছু কিছু ব্যক্তি আছে যারা দেশের প্রতি ভালবাসায় নয়, শুধু ব্যক্তিস্বার্থে আঘাত লাগবার কারণেই বিদ্রোহীদের দলে নাম লেখাতে চায় এবং রাতারাতি বিদ্রোহ বা বিপ্লব ঘটাতে চায়। এ'জাতীয় বিদ্রোহীদের পরিচয় পাওয়া যায় বিদ্রোহী সংঘ গল্পে। আগাগোড়া উদ্ভট কৌতুক উপাদানে ভরা গল্প 'বিদ্রোহী সংঘ'। চাকরী লাভে ব্যর্থ হয়ে একজন ব্যক্তি রাতারাতি প্রচণ্ড বিদ্রোহী হয়ে গেল এবং সত্যিকার বিদ্রোহীদের খোঁজে সারা কলকাতা ঘুরে অবশেষে ঢাকার বিদ্রোহী সংঘের সন্ধান পেল। বিদ্রোহীসংঘে ঘোরাফেরা করে সে হতাশ হল। কারণ বিদ্রোহীসংঘের বিদ্রোহ ছিল, প্রচলিত নিয়মকানুনের উল্টোটা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাদের কাছে গান গাওয়া মানে বেসুরো চীৎকার, স্বাধীনতা মানে কোন আইন না মানা ইত্যাদি। তাদের বিদ্রোহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়; কেননা, ইংরেজরা হাত পা বাঁধলেও আত্মা বাঁধেনি। বিশ্ব-মানবতা তাদের আদর্শ—সে অর্থে ইংরেজও তাদের পর নয়। এ ধরনের বিদ্রোহী সংঘের সন্ধানদাতার ওপর নব্য বিদ্রোহী খুব চটেছিল। হঠাৎ সন্ধানদাতার দেখা পেলে জানতে পারল সন্ধানদাতা আসলে সি, আই, ডির লোক এবং সেও তার হতাশার কথা ব্যক্ত করল আসল বিদ্রোহীদের খুঁজে না পাওয়ার কারণে। অন্যদিকে নব্য বিদ্রোহীর আচরণে তথাকথিত বিদ্রোহীসংঘের সদস্যরা সন্দিগ্ধ হল এবং ইংরেজদের কাছে লিখে জানাল ইংরেজ তাড়ানো তাদের উদ্দেশ্য নয়। ঘটনাচক্রে সে চিঠি পেঁছবার আগে ইংরেজ পুলিশদের, সংঘের দিকে আসতে দেখা গেল। যথারীতি অভিনব কায়দায় নেতাসহ সকলে সংঘের অফিস থেকে পালাল।

গল্পটি উত্তম পুরুষে কথিত। কয়েকটি উদাহরণ নিলেই বিদ্রোহের নমুনা পাওয়া যাবে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড যার মনে ইংরেজ বিদ্বেষ জাগাতে পারেনি, ব্যক্তি স্বার্থে আঘাত লাগবার সাথে সাথেই সে বিদ্রোহী হয়ে গেল। "আমার ভিতরে ইংরেজ-বিদ্বেষের বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল সেইদিন—পুনঃ পুনঃ চাকরীর ভরসা দিয়াও যেদিন জেমস সাহেব আমাকে তাহার অফিস গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য হুকুম দিয়া বসিলেন।"[৩২] যথেচ্ছাচারের জন্য যাদের কাছে স্বরাজের আবশ্যকতা, তাদেরও ব্যঙ্গ করা হয়েছে এ গল্পে। "ইহার উপর বিনা টিকেটে ট্রামে চড়ার অপরাধে যেদিন গোরা চেকার আমাকে একটাকা জরিমানা লাগাইল, সেইদিন আমার মধ্যে বিদ্রোহের রক্ত টগবগ করিয়া উঠিল। স্বরাজের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ থাকিল না"[৩৩] গোপনে রাজভক্তি

প্রদর্শনকারী তথাকথিত সামাজিক সংস্কারের ধ্বজাধারীদের ব্যংগ করা হয়েছে এভাবে—'আর ম্যাজিস্টেট ও পুলিশ সাহেবের কাছে এখনই এ'মর্মে দু'খানা পত্র লিখে দাও যে, বিশ্বমানবতাই আমাদের আদর্শ। সোশিয়াল রিফর্মই আমাদের কর্মপদ্ধতি; বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জন্য আমরা প্রাণ দিতে পারি, আরো লিখে দাও যে, আমাদের সভাপতির মামাতো ভাই গত মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।''[৩৪]

দেশসেবার নামে আত্মসেবা ও রাজনৈতিক ভণ্ডামি

"The earliest political groups in south Asia can be characterised more as interest groups than as political parties"[৩৫] দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি প্রসঙ্গে এ বক্তব্যের যথার্থ নিয়ে সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ নেই। রাজনৈতিক আদর্শের চাইতে অধিকাংশ দলের কাছে দলীয় কর্মী-দের ব্যক্তিস্বার্থ অনেক বড়। এবং এ' ব্যক্তিস্বার্থ হাসেলের জন্য চলতে থাকে গলাবাজি, ধাপ্পা, ভণ্ডামি। চলতে থাকে ধাপ্পার মাধ্যমে ক্ষমতালাভের অন্তহীন প্রচেষ্টা; নিজে নেতা হবার জন্য নতুন নতুন দল সমিতি গঠন। মুখে অনবরত দেশপ্রেমের বুলি। দেশপ্রেমের বুলি আওড়াবার সহজতম পন্থা বক্তৃতা। কাজের চাইতে নেতাদের ঝোঁক বেশী বক্তৃতার প্রতি এবং অধিকাংশ বক্তৃতা প্রতারণামূলক। বক্তৃতাবাজি প্রসঙ্গে ওয়েনারের পর্যবেক্ষণ সুন্দর। প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় দিবস, কোন নেতার জন্ম-মৃত্যু দিবস—সুযোগ পেলেই রাজনীতিবিদেরা বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। তাছাড়া, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, কোন বিদ্যালয়ের পাকাভবনের উদ্বোধন, গভীর নলকূপ বসানো—জাতি ও দেশগঠনমূলক এ'সব কর্মকাণ্ডও নেতাদের গলাবাজির মোক্ষম সুযোগ এনে দেয়।[৩৬] সবকিছুর মূলে ক্রিয়াশীল একমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ। অধিকাংশ রাজনীতিকরা শুধু ভণ্ড বা প্রতারকই নয়, অশিক্ষিতও বটে। 'জনসেবা ইউনিভার্সিটি; এ. আই. সি. সি. জমিদারি উচ্ছেদ, আহা যদি প্রধানমন্ত্রী হতাম, রাজনৈতিক বাল্যশিক্ষা—এবং রাজনৈতিক ব্যাকরণ রচনাসমূহে এ জাতীয় রাজনীতিবিদদের সাক্ষাৎ মেলে।

'জনসেবা ইউনিভার্সিটি'র ইয়াকুব যখন নিজের জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হল, তখন জনসেবা করেই জীবন কাটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আত্মসেবা করতে হলে যেমন ডিগ্রীর প্রয়োজন, জনসেবা করতে হ'লেও তেমনি ডিগ্রির প্রয়োজন ব'লে সে জনসেবা ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ ডক্টরেট ডিগ্রীর প্রচেষ্টায় নামল। সে প্রথমে জনসেবার ইনফ্যান্ট ক্লাশ অর্থাৎ জনসেবার সামাজিক দায়িত্ব পেল। তারপর জনসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রাইমারী পাস করল অর্থাৎ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হল। তারপর ক্রমান্বয়ে সেকেণ্ডারী,

ইণ্টারমিডিয়েট, বি. এ., এম. এ. এবং ডক্টরেট লাভ করল অর্থাৎ যথাক্রমে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, আইনসভার সদস্য, মন্ত্রী, লাট এবং খান বাহাদুর স্যার লর্ড হল। এর সবগুলিই সে হয়েছিল জনগণকে 'আশার পর আশা দিয়ে। আঁশার ছলনে ভুলি' জনগণ তাকে যথাসাধ্য সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়েছিল। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছিল কি? নিশ্চয়ই। "চেহারাও খুব খানিকটা বদলাল বটে, কিন্তু দেশেরও নয়, জনসাধারণেরও নয়—ইয়াকুবের নিজের। শেরওয়ানি পাজামা ফেলে, দাঁড়িমোচ কেটে, কোট-প্যান্টুলান প'রে ইয়াকুব মিয়া ইয়াকুব সাহেব হল।"[৩] এবং সে সাথে শুধু শ্বেতাবী লাট বাহাদুর ও অসার সার নন। একটা জমিদারীর সারবান লর্ড বাহাদুরও হলেন ইয়া কুব সাহেব। বার্ষিক চার লক্ষ টাকার জমিদারি। কিন্তু জনসেবার কোন হিল্লে? আত্মীয় সেবাও তো জনসেবার পর্যায়ে পড়ে। আর কিছু? লর্ড জ্যাকব (নামেরও পরিবর্তন ঘটেছিল) জনসেবা করলেনও খুব। গ্রামে নিজের নামে একটা হাইস্কুল, বাপের নামে একটা খয়রাতি দাওয়াখানা ও মায়ের নামে একটা জুনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপন করলেন। আর কিছু? চার লক্ষ টাকার জমিদারি থেকে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন অনেক টাকা—বার্ষিক তিনশত একত্রিশ টাকা। দেশে ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল।

স্পষ্টতঃই জনসেবা ইউনিভার্সিটি গল্পে লেখক জনসেবার নামে আত্ম-সেবাকারী বড়জোর আত্মীয়সেবাকারীদের ব্যঙ্গ করেছেন। সমাজ পরিবর্তনের আশ্বাস দিয়ে নির্বাচিত হয়ে ইয়াকুব মিয়া শুধু নিজের এবং কিছুটা আত্মীয় স্বজনের অবস্থার পরিবর্তন করেছিলেন। দানবীর বলে পরিচিত হলেন চার লক্ষ টাকার জমিদারি থেকে মাত্র বার্ষিক তিনশত একত্রিশ টাকা দান করে। ইয়াকুবের মত আদর্শ থাকতে জনসেবার নামে আত্মসেবার এ সহজ সুযোগ কি জনগণ হাতছাড়া করে? চমৎকার আয়রনির মাধ্যমে এর উত্তর দিয়েছেন লেখক—"ইয়াকুব সাহেবের আদর্শজীবন আজো এ'দেশের সকল তরুণবৃদ্ধের প্রাণে জনসেবার অনুপ্রেরণা জাগাচ্ছে। তাই না এদেশে জনসেবকের এমন ভিড়!"[৩৮]

জনসেবা ইউনিভার্সিটির মতই আরেকটি গল্প জমিদারি উচ্ছেদ। জমিদারি উচ্ছেদের ভাঁওতা দিয়ে গ্রামের সাধারণ ব্যক্তি মুন্‌শীজি আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল জমিদারি উচ্ছেদ হয়নি বটে তবে জমিদার উচ্ছেদ হয়েছে। দুঃখের বিষয়, নতুন জমিদার হয়েছিলেন স্বয়ং মুনশীজি। ভাঁওতাবাজির এখানেই শেষ নয়—গ্রামের সাধারণ জনগণকে তিনি পুনর্বার বোঝালেন, তিনি জমিদার না হলে ভিনগাঁয়ের লোক জমিদার হতেন এবং খাজনার টাকা পয়সা ভিন গাঁয়ে চলে যেত। জনগণ তাকে পুনর্বার নির্বাচিত করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এ গল্পেও নির্বাচনী ওয়াদা ভঙ্গকারী ভণ্ড রাজনীতিকদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে। পরিবর্তন নেতারা করেন বটে, তবে দেশের বা সমাজের নয়, নিজের। "তিনি তহবন্দ পরে গিয়েছিলেন, শেরওয়ানি পরে ফিরে এলেন। পায়ে হেঁটে ষ্টেশনে গিয়েছিলেন, ঘোড়ার গাড়ী চড়ে ফিরে এলেন।"[৩৯] তাছাড়া, মুনশীজির মতো চরিত্ররা শুধু নির্বাচনী ওয়াদা ভঙ্গ করে ক্ষান্ত হন না, নিরক্ষর জনগণের সাথে কি রকমের ভণ্ডামি করেন, তাও এ'গল্পে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে' "আমি তোমাদের প্রতিনিধি। আমার জমিদারি দখল করা মানেই প্রজার জমিদারি দখল করা। এও এক রকম জমিদারি উচ্ছেদ বৈকি ?[৪০]

জমিদারি উচ্ছেদ এর পটভূমি প্রসঙ্গে নুরুল আমিনের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।" আমরা জানি, কৃষিপ্রধান গ্রাম বাঙলার ইতিহাস দীর্ঘদিন ধরে জমিদার কর্তৃক প্রজাদের উপর উৎপীড়নের ইতিহাস। ঐতিহাসিক কারণেই পূর্ব বাঙলার অধিকাংশ প্রজারা মুসলমান এবং জমিদাররা হিন্দু। অতএব বিশ শতকের গোড়ার দিকে কৃষক প্রজা পার্টি (১৯২৯) গঠনের পর স্বাভাবিক ভাবেই তা পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় কৃষকরা কিছু কিছু সুযোগ সুবিধাও লাভ করে। ১৯৩৫ সালের নতুন আইনে ছয় আনা ট্যাক্সওয়ালারা ভোট দেওয়ার অধিকার পায়। এতে করেই নেতাদের কাছে প্রজাদের কদর বেড়ে যায়—বিশেষতঃ ভোটের সময়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে শুধু ময়মনসিংহ জেলাতেই ষোলটি মুসলিম সিটের মধ্যে কৃষক প্রজা পার্টি পেয়েছিল এগারটি এবং মুসলিম লীগ মাত্র পাঁচটি। অতএব কৃষক প্রজাদের চেতনা এসেছিলো স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু অজ্ঞ নিরীহ চাষাদের এ চেতনা আর কতদূরই বা এগোয়। এ-সুযোগে মুনশিজীদের মতো সুবিধাবাদী চরিত্রগুলোই শুধু নিজেদের হাত প্রসারিত করেছিলো, চাষাদের কোনো পরিবর্তন আসেনি।[৪১]

রাজনীতি পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্প এ. আই. সি. সি। এ গল্পে অজস্র দলবাজি সমিতিবাজি থেকে শুরু করে দেশসেবায় নিরপেক্ষতার অভাব, কৃত্রিম শোকসভার আয়োজন, জনগণকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে নেতাদের নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান ইত্যাকার বিবিধ প্রসঙ্গকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। গল্পের সংক্ষিপ্ত কাহিনী নিম্নরূপ—শহীদ চাকরী না পেয়ে সহজতর পন্থা অর্থাৎ মন্ত্রীত্বলাভের দিকে অগ্রসর হল। কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিম লীগের শরাফতি অপছন্দের কারণে নিরপেক্ষ সংগঠনের উদ্যোগ নিল। কিন্তু যে-নামেই সে সমিতি করতে চায়, সে'নামেই সমিতি আছে। সে 'অল ইণ্ডিয়া কনডোলেন্স কংগ্রেস (এ, আই, সি, সি,) স্থাপন করল। উদ্দেশ্য—প্রয়াত নেতাদের জন্য যৌথভাবে অকৃত্রিম শোকপ্রকাশ। শহীদ মারা যাবার

আড়াই শত বছর পরের কথা। এক জনসভায় পঁচিশসালা রিপোর্টে জানানো হল—নেতারা কেউ মরছে না ব'লে শোকসভা পালনে সমস্যা দেখা যাচ্ছে। নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করা হ'লে তারা মরতে নারায ব'লে জানালেন। তাদের যুক্তি—'যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য মরে, সেনাপতি মরে না' ইত্যাদি ইত্যাদি। শোক প্রকাশের জন্য নেতা পাওয়া গেল না ব'লে সভা স্থগিত ঘোষিত হল এবং মরবার জন্য নেতাদের অর্ধশতাব্দী সময় দেয়া হল।

আগেই বলা হয়েছে, গল্পে সমিতিবাজিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। শহীদ পথে ঘাটে হাজার হাজার সমিতি দেখে অগত্যা দর্জি-সমিতি গঠনের সম্ভাবনা ভাবছিল। "সে হাফসার্ট কেনা ফেলিয়া কল্পিত দর্জি সমিতির কনস্টিটিউশন রচনার জন্য ফিরিয়া বাসায় ছুটিল। রাস্তায় মোড় ঘুরিবার সময় হঠাৎ এক দোতলার রেলিং এ প্রায় পনের হাত সাইনবোর্ডে লেখা দেখিল "নিখিল দর্জি সমিতি"।[৪২]

এ. আই. সি. সি. র অন্যতম উদ্দেশ্য একই সাথে, ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যকর। "অনেক অর্থ বিত্তশালী লোকের আত্মীয়-স্বজন নিজেদের পরলোকগত আত্মীয়ের নামে ঢাক-ঢোল পিটাইবার উদ্দেশ্যে নিজেরাই অর্থ ব্যয় করিয়া কৃত্রিম শোকসভার আয়োজন করে এবং তাতে প্রকৃত গুণী লোকের স্বার্থহানি হইয়া থাকে। এইসব অনাচার, করাপশন ও এডালটেরেশন দূর করিবার জন্য সমিতি শোক প্রকাশের একমাত্র অধিকারীরূপে নিজেদের অধিকার পেটেন্ট রেজেস্টারী করিবে।"[৪৩] এ গল্পে তথাকথিত নেতা ও সেনাপতিদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবং সেনাপতিরা কেন যুদ্ধে এগিয়ে আসেন না ব্যঙ্গাত্মক যুক্তির মাধ্যমে তাও তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু তিনি আগাইয়া আসিয়া প্রাণত্যাগ করিলে যুদ্ধ থামিয়া যাইবে; তাতে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক মরিবার চান্স হইতে রক্ষিত হইবে।"[৪৪]

এ. আই. সি. সি গল্পে আসলে সমকালীন নেতৃত্বকে চূড়ান্তভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। গল্পকার বলতে চেয়েছেন, যতদিন এ নেতৃত্ব থাকবে ততদিন জনগণের কপালে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। এদেশে এ. আই. সি সি.র কোন সার্থকতা নেই; কেননা, বর্তমান নেতৃত্বের কোন মৃত্যু নেই।

বলা হয়েছে, এ. আই. সি. সি.র অন্যতম উদ্দেশ্য হাস্যকর। আসলে গল্পের পরিকল্পনা ও পুরো গল্পে রয়েছে কৌতুকের আবহ। "শহিদ বলিতে লাগিল : নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপারের জন্যও আমাদের সংঘ সমিতি আছে; কিন্তু আমাদের যে পূজনীয় নেতৃবৃন্দ ও মনীষী মহাপুরুষেরা দেশ ও সমাজের জন্য তিলে তিলে আত্মদান করিয়া পরলোকে চলিয়া যান, তাঁদের মৃত্যুতে সংঘবদ্ধভাবে শোক প্রকাশের জন্য কোন কনডোলেন্স কমিটি নাই। ভাবুন

একবার ভ্রাতৃগণ, তাঁদের নিমতলায় পোড়াইবার জন্য সৎকার সমিতি আছে; তাঁদের গোবারায় গাড়িবার জন্য আঞ্জুমান-ই মুফিদুল ইসলাম আছে। অথচ তাদের মৃত্যুতে সংঘবদ্ধভাবে একবিন্দু চোখের পানি ফেলিবার জন্য একটা শোক প্রকাশ সমিতি নাই (এইখানে শহিদ রুমালে চোখ মুছিল)। এটা কত বড় অকৃতজ্ঞতা, কতবড় বেঈমানি (এইখানে শহিদের চোখে মুখে ঘৃণা বিতৃষ্ণার আগুন জ্বলিয়া উঠিল)।[৪৫] এবারে আরেকটি উদাহরণ নেয়া যাক। "বোম্বাই শহরে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির নেতৃরক্ষা-সাব-কমিটির স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বর হিসাবে মিঃ গান্ধী, মিঃ জিন্না ও মিঃ হক প্রভৃতি নেতারা যুক্তভাবে এ, আই, সি, সি,র ডেপুটেশনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছেন। নেতৃরক্ষা-সাব-কমিটির সভাপতি পণ্ডিত হীরালাল নেহরু ও সেক্রেটারী ডাঃ ধান্যভি সীতারামায়া খাকচারী বেলচার হাত হইতে নেতৃবৃন্দকে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট পুলিশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তথাপি সাবধানের মার নাই হিসাবে মিঃ গান্ধী তাঁর প্রাতঃস্মরণীয় প্রপিতামহ মহাত্মাজীর ছাগলটি, মিঃ জিন্না তাঁর প্রমাতামহ কায়েদে-আযমের আকসিরের বোতলটি ও মিঃ হক তাঁর প্রমাতামহ শেরে বাঙলার তাবিজের বান্ডিলটি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন।।[৪৬]

নেতাদের রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে 'অতে অজগর আসছে তেড়ে' স্টাইলে রচিত রাজনৈতিক বাল্যশিক্ষা ও রাজনৈতিক ব্যাকরণ। রচনা দুটিতে। নেতাদের রাজনৈতিক শিক্ষা কতদূর এবং কোন উদ্দেশ্যে ধাবিত দু'টি বা তিনটি উদ্ধৃতি থেকে সহজবোধ্য হবে।

> "আ—আমদানী রফতানীর আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই যে আমদানী মানে আমার পকেটে আমদানী, রফতানী মানে তোমার পকেট হইতে রফতানী।"[৪৭]

> "দ—দল বা পার্টি মানে একই উদ্দেশ্যে কতিপয় লোকের একত্রিত হওয়া যথা জয়েন্ট স্টক কোম্পানী। স্টক যদি জয়েন্ট না থাকে, তবে দল ত্যাগ করতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করিও না।"[৪৮]

ওয়েনার দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে 'ইন্টারেস্টগ্রুপ' এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। উদ্ধৃতি থেকে ওয়েনারের মন্তব্যের যথার্থতা সহজবোধ্য।

'রাজনৈতিক ব্যাকরণে' প্রচলিত বিভিন্নটার্ম-এর অভিনব সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যেমন :—

> "অব্যয়—যে পদে কোনও ব্যয় হয় না, শুধু আয় হয়, তাকে অব্যয় বলা হয়। যে সব পদে বেতনের উপরি ড্রাইভারসহ গাড়ি, ফ্রিকন্ডেশন্ড বাড়ী.....ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে, সেখানে বেতনের টাকা ব্যয়

করিবার কোনও রাস্তা নাই বলিয়া এইসব পদকে অব্যয় পদ বলা হয়।"[৪৯]

এ ধরনের যুক্তিতে ফ্যালাসি প্রসঙ্গ মনে আসতে পারে। আবুল মনসুর আহমদ বিভিন্ন রচনায় প্রচুর ফ্যালাসি ব্যবহার করেছেন ব্যঙ্গরস সৃষ্টির অন্যতম কৌশল হিসেবে। এদেশের ফ্যালাসিতে ভরা রাজনীতিকে ব্যঙ্গ করতে গেলে ফ্যালাসির ব্যবহার না ক'রে উপায়ইবা কি আছে!

নির্বাচন প্রহসন ও ভোটরঙ্গ

রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ভোটপ্রসঙ্গ। ভোটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নির্বাচনী ওয়াদা, ওয়াদাভঙ্গ, ভোট ক্রয়-বিক্রয় নমিনেশন ক্রয়-বিক্রয়, দল-ত্যাগ, সম্ভাব্য বিজয়ীদলে যোগদান আরো কত কি। 'জনসেবা ইউনিভার্সিটি' ও 'জমিদারি উচ্ছেদ' গল্পে নির্বাচনী ওয়াদা ভঙ্গের পরিচয় মিলেছিল। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে শুধু যে নির্বাচন প্রার্থীদের চরিত্র নেই তা নয়, এক হিসেবে অধিকাংশ ভোটারেরও চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই। "Not only are the loyalties of leaders to parties weak in Pakistan, it would seem that the voters, loyalties are weak too"[৫০] ওয়েনারের এ মন্তব্য পাকিস্তান-বাঙলাদেশ সম্পর্কে আগেও প্রযোজ্য ছিল, এখানে প্রযোজ্য। আবুল মনসুর আহমদ 'চেঞ্জ অব হার্ট', 'বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে' 'ইলেকশন' আহা! যদি প্রধান মন্ত্রী হতে পারতাম প্রভৃতি গল্পের মাধ্যমে এ অঞ্চলের ভোট ব্যবস্থার অসুন্দর দিকগুলোকে ব্যঙ্গ করেছেন। প্রথমেই চেঞ্জ অব হার্টের' কৌতুকে পূর্ণ শুরুটা শোনা যাক—"আইনসভার নির্বাচনের মওসুম পড়িয়াছে। ক্যানডিডেটের ভিড় লাগিয়াছে। চাকুরিয়া চাকুরী ছাড়িয়া, উকিল ওকালতি ছাড়িয়া, মাষ্টার মাষ্টারি ছাড়িয়া, দোকানদার ব্যবসায় ছাড়িয়া, পীরসাহেব পীরগিরি ছাড়িয়া, এমনকি মেয়েরা গিন্নীপনা ছাড়িয়া, আইনসভার মেম্বরির দরখাস্ত করেছেন।"[৫১] তারপর যথারীতি দলবদলের পালা এবং সম্ভাব্য বিজয়ীদলে যোগদান। 'চেঞ্জ অব হার্টে'র নযির মিয়া নির্বাচনী মওসুম শুরু হ'লে, চাকরী দূরে ফেলে এককালীন শত্রুদল লীগের টিকেট প্রার্থনা করলেন; কেননা, লীগের জেতার সম্ভাবনা বেশী অন্যান্য দলের চাইতে। লীগ-নেতাদের কাছে গিয়ে লীগ মেনিফেস্টো সমর্থন এবং তার 'চেঞ্জ অব হার্ট'-এর কথা বললেন অর্থাৎ আগে লীগ বিরোধী থাকলেও বর্তমানে লীগ বিরোধী নন। লীগনেতারা নযির মিয়ার লীগ-ভক্তিতে নিশ্চিত হয়ে জানালেন, নযির মিয়াকে নমিনেশন দেওয়া সম্ভব হবে না। অবশ্যি নমিনেশন না-দেওয়ার পেছনে নযির মিয়ার লীগ ভক্তি যাঁচাই অথবা অন্যকোন কারণ নিহিত ছিল। নযির

মিয়া অবাক হলেন এবং লীগ-বিরোধী হিসাবে নির্বাচনে দাঁড়ালেন। নির্বাচনে হারবার পর বিবি 'হায় হায়' করতে শুরু করলে নষির মিয়া জানালেন "দেশের নেতাদের সত্যিকার চেঞ্জ অব হার্ট হয়েছে কিনা তাই পরখ করবার জন্য তিনমাসের ছুটি নিয়েছিলাম মাত্র।"[৫২]

আসলে নষির মিয়া তথা এদেশের অধিকাংশ নির্বাচন প্রার্থী এবং রাজনৈতিক নেতাদের 'চেঞ্জ অব হার্ট' হয় না, চৈঞ্জ অব পার্টি হয় মাত্র। নষির মিয়ারা দলবদল অথবা মতবদল করেন, 'লীগ'কে ভালবেসে নয়, আইনসভার সদস্যপদকে ভালবেসে—বাড়ী গাড়ীর স্বপ্নকে ভালবেসে। সেহেতু আশা এবং আশাভঙ্গের কারণে তাদের একাধিকবার চেঞ্জ অব হার্ট হয়। তাছাড়া যারা নমিনেশন দেয়ার অধিকারী, সে-সব নেতাদের আন্তরিকতা কতটুক, তাও বিবেচ্য। তাদের বক্তব্য, "এলাকার লোকেরা যাকে চায়, তাকেই টিকিট দিলে ভোটারদের লীগ-প্রীতিত টেস্ট করা হল না.....সেজন্য এলাকার লোকেরা চায় না এমন লোককেই আমরা লীগ টিকেট দিয়েছি, বুঝলেন।[৫৩] এখানে 'লীগ প্রীতি-টেস্ট, "এলাকার লোকেরা চায় না এমন লোককেই টিকেট দেয়া ইত্যাকার শব্দ-সমষ্টির আপাত-অর্থের পেছনে নমিনেশন দাতা নেতাদের চক্রান্ত ও স্বজনপ্রীতি বোঝা যায়।

'চেঞ্জ অব হার্ট' গল্পে ব্যঙ্গ করা হলো চেঞ্জ অব পার্টিকে অর্থাৎ দল বদলকে আর বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে গল্পে ব্যঙ্গ করা হয়েছে নমিনেশান ব্যবসানে। টাকার জোরে নমিনেশন পাওয়া অথবা কেনা এবং টাকার বিনিময়ে নমিনেশান ছেড়ে দেওয়া ইত্যাকার চিত্রগুলো চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে 'বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে' গল্পে। মাহমুদ কর্পোরেশনের ইলেকশনে নমিনেশন পেয়ে টাকার বিনিময়ে এক চামড়ার সদাগরের কাছে নমিনেশন বিক্রি করেছিল। লীগ অফিস থেকে ফেরার পথে বন্ধুদের বক্তব্য "মাহমুদ নিয়ে বের হল টাকা; সদাগর সাব নিয়ে এলেন লীগের নমিনেশন; আর আমরা নিয়ে এলাম চরম বিস্ময়।" এ বিস্ময় হয়তোবা গল্প পাঠকেরও। কিন্তু এ অঞ্চলের নমিনেশন ব্যবসার সাথে যারা পরিচিত তাদের কাছে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। পার্টি কর্মী না হয়েও টাকার জোরে অনেক সময় নমিনেশন কেনা যায় এদেশে এবং সংবাদপত্রে বের হয় প্রবীণ লীগ কর্মীর প্রার্থীপদ লাভের খবর।

'ইংরেজ আমলে যখন দেশীয় মন্ত্রী নিয়োগ ও আইন সভার নির্বাচন প্রবর্তন হয় তখন জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলার নির্বাচনে অংশগ্রহণ, পরাজয় ও পুনরায় সরকারী চাকরীর তদবীর ইলেকশনের বিষয়। আমলা যে মূলতঃ জনসংযোগহীন, তার ক্ষমতা জ্যোতি কেবল চেয়ার বিচ্ছুরিত এবং অবসর প্রাপ্তির পরই মাত্র সমাজে ও দেশে তার যথার্থ স্থান নির্ধারিত হয়।

ইলেকশন গল্পে এ বক্তব্য লেখক চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।[৫৪] আনাড়ি নির্বাচনপ্রার্থী খানবাহাদুর খোদাবখ্‌শ এবং তাঁকে মাঠে নামিয়ে যারা পয়সা এবং মজা লুটেছে সে সব প্রতারক ভোটারদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে ইলেকশন গল্পে। সে-সাথে খোদাবখ্‌শ সাহেবের ইংরেজ প্রীতি এবং স্বরাজবিরোধিতাকেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে নিপুণভাবে। ভোট লাভে ব্যর্থ হয়ে খোদা বখ্‌শের উক্তি "এখন বুঝলেত আমার কথাই ঠিক। ঐ দেশবাসী আজো ভোটাধিকার পাবার যোগ্য হয়নি। এখানে স্বরাজ স্বাধীনতার কথা বলা বাতুলতা মাত্র।' বলা বাহুল্য, খোদাবখ্‌শ সাহেব নির্বাচনে জিতলে একই ভোটারদের ভোটাধিকার পাবার যোগ্য বলে ভাবতে পারতেন। "আহা! যদি প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম প্রসঙ্গে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের বক্তব্য উদ্ধৃত হতে পারে। "আহা! যদি প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম"—এই কাহিনীতে প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক ওয়াহেদ মাষ্টারকে সামনে রেখে লেখক পাকিস্তানী রাজনীতির উপরিতলের ভণ্ডামিকে তুলে ধরেছেন। নির্বাচন, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রসঙ্গে এখানে মন্তব্য তীব্র ব্যঙ্গ মিশ্রিত ঃ দেশে নির্বাচনের কোন প্রয়োজন নেই, কেননা ঃ

"ইলেকশন হলে জাতীয় প্রতিষ্ঠান শতকরা একশটা সীটই দখল করবে, কারণ দেশবাসী অন্তরে অন্তরে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পিছনেই আছে।[৫৫]

বিদেশী শাসন প্রীতি ও খেতাবের মোহ

বিদেশী শাসন অর্থাৎ ইংরেজ প্রীতি ও ইংরেজ প্রদত্ত খেতাবের মোহকে আবুল মনসুর আহমদ বিভিন্ন গল্পে ব্যঙ্গ করেছেন। ইলেকশন গল্পেও তার কিছুটা পরিচয় মেলে। কিন্তু খেতাবের মোহ এবং খেতাব ত্যাগের মর্মান্তিক যন্ত্রণা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মডার্ণ ইবরাহীম গল্পে। একই সাথে কমিক, ব্যঙ্গ ও হিউমারের সুনিপুণ ব্যবহার আবুল মনসুরের খুব বেশী গল্পে নেই। এ গল্পে খান বাহাদুরের বিভিন্ন আচরণে পাঠক হাসবেন, না কাঁদবেন নাকি ঘৃণা প্রকাশ করবেন বুঝে ওঠা মুশকিল। কয়েকটি উদাহরণ নেয়া যাক—

১. খানবাহাদুর মেইন গেটটায় তালা লাগিয়ে এসে বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করলেন। তারপর মাথা উঁচু করে দেওয়ালে-লটকানো সোনালী ফ্রেমে বাঁধা [খান বাহাদুরীর সনদটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন।[৫৬]

২. চেয়ারে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে অতি সন্তর্পণে তিনি দেওয়াল থেকে সনদটি পাড়লেন। চেয়ার থেকে নেমে ঝুলানো টেবিল ক্লথের আঁচল দিয়ে সযত্নে তা মুছলেন।.....ভাল করে দেখবার জন্য একবার এগিয়ে

আনলেন, আবার পিছিয়ে নিলেন। যতই দেখেন ততই ভাল লাগে। লম্বা হাত আস্তে আস্তে শিথিল ও বাঁকা হয়ে সনদটি খানবাহাদুরের বুকের কাছে এসে পড়ল।

তিনি সবলে ওটাকে চেপে ধরলেন।

দর দর করে খান বাহাদুর সাহেবের চোখ থেকে পানি ঝরিয়ে তার সাদা দাড়ি ভিজিয়ে দিল।[৫৭]

৩. লাহোর প্রস্তাবের কোথাও একথা লেখা নেই যে, পাকিস্তানে খেতাব থাকবে না। বিশেষ করে নবাব, খানবাহাদুর, খান সাহেব এগুলি সবই মুসলমানি খেতাব।.....ইংরাজ রাজত্বে মুসলমানদের আর সবই গেছে। থাকবার মধ্যে আছে মাত্র এই কয়টি মুসলমানি খেতাব। এই খেতাব বর্জনের প্রস্তাব করে লীগের বোম্বাই বৈঠক বেআইনী ও ইসলাম বিরোধী কাজই করেছেন।[৫৮]

৪. সে যুগে পুত্রই ছিল মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। তাই তখন পুত্র কোরবানীর হুকুম হয়েছিল। আর আজ খেতাবই হয়েছে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু।.....যদি সে যুগে না হয়ে এই যুগে হযরত ইব্রাহীম নাযিল হতেন, তবে তাঁর উপর পুত্র কোরবাণীর আদেশ না হয়ে খেতাব কোরবাণীরই আদেশ হত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অতএব ভাই সাহেবান, আপনারা খেতাব কোরবানী করে সকলে মডার্ণ ইবরাহিম হোন।[৫৯]

৫. কিন্তু জান বিবি, তোমাকে এ বয়সে হারালে আমার যে কষ্ট হবে, খেতাব ত্যাগের কষ্ট তার চেয়ে কম হচ্ছে না। মমতাজকে হারিয়ে শাহজাহানের কি ব্যথা হয়েছিল, আজ তা বুঝতে পারছি। আমি খেতাব ত্যাগ করব বটে, কিন্তু তার উপর আমি তাজমহল রচনা করব।[৬০]

যথাসময়ে খানবাহাদুর সাহেব তাঁর খেতাব ত্যাগের পত্র যেদিন লাটের কাছে পাঠালেন সেদিন বাড়ীর সামনের বাগানের ঠিক মাঝখানে ধুমধামের সংগে সোনালী ফ্রেমে বাঁধা সনদটির দাফন করলেন এবং তার উপর একটি ক্ষুদে মাকবেরা তৈরী করে তাতে মার্বেল পাথরে প্রথমে বাঙলায় ও পরে ইংরেজীতে লিখে রাখলেন :

পাকিস্তান জিহাদের প্রথম শহীদ
শায়িত হেথায়।[৬১]

খেতাব ত্যাগের আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছিল সে পরিপ্রেক্ষিতে মডার্ণ ইবরাহিম গল্পটি লিখিত। রচনাকাল ১৯৪৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইটপদবী পরিত্যাগ করে একটি পত্রে তৎকালীন ভাইসরয়কে লিখেছিলেন—The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous contem of humiliation, and I for my part, wish to stand shorn of all special distiactions, by the side of those of my countrymen, who for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings"[৬২] রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুধাবন করতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল।

অর্থনৈতিক ব্যঙ্গ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও ১৯৫২ সালের পাকিস্তানের লবন সংকট আবুল মনসুর আহমদের অর্থনৈতিক ব্যঙ্গের জন্ম দিয়েছে। এ পর্যায়ে গল্পগুলোর মধ্যে দুর্ভিক্ষের গল্পই বেশী এবং অধিকাংশ গল্প ফুডকনফারেন্স গ্রন্থভুক্ত।

১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ

১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ অথবা বাংলা ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম মর্মান্তিক লোকক্ষয়ী আকাল।[৬৩] স্বয়ং আবুল মনসুর আহমদ এই দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মৃত্যু অনুমান করেছেন।[৬৪] বাঙলার প্রতিটি অঞ্চল কমবেশী এ দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এক জরীপের মাধ্যমে প্রফেসর কে, পি, চট্টোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা সাড়ে তিন মিলিয়ন বলেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতার অলিগলিতে অজস্র লোক মৃত্যুবরণ করলেও, মৃতদের কেউ কলকাতার ছিলেন না।[৬৫] 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছরে, আবুল মনসুর আহমদ নিজেই লিখেছেন, 'কলিকাতা শহরের রাস্তাঘাটে সেদিন যা দেখেছিলাম তাই এতদিন পরেও বিষম যন্ত্রণাদায়ক দুঃস্বপ্নের মতই স্মৃতিপথে উদিত হয় এবং গা শিহরিয়া উঠে। নিরন্ন রুগ্ন অস্থি চর্মসার উলঙ্গ নরনারীর মিছিল আমরা শুধু এই সময়েই দেখিয়াছি। ডাষ্টবিনে খাদ্যের তালাশে মানুষে-কুত্তায় কাড়াকাড়ি করিতে তখনই আমরা প্রথম দেখিয়াছি।.....কোথা হতে এত লোক আসিতেছে ? খবরের কাগজে পড়িলাম, শস্য-ভাণ্ডার পূর্ববাঙলার পল্লীগ্রাম হইতেই এই মিছিল আসিতেছে বেশী।'[৬৬]

বাঙলার এই দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল নাযিমউদ্দীন মন্ত্রীসভার আমলে ১৯৪৩ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে। দুর্ভিক্ষের জন্য নাযিমুদ্দীন সরকার অবশ্যই দায়ী ছিলেন। তাছাড়া দায়ী ছিলেন তৎকালীন ভারত সরকার। যুদ্ধ প্রচেষ্টার অন্যতম পন্থা হিসেবে তারা বাঙলার চাউল সংগ্রহ করে জবলপুরে গুদামজাত করেছিলেন। জাপানীদের হাত থেকে দেশী যানবাহন সরানোর মতলবে 'ডিনায়েল পলিসি' হিসেবে সমস্ত নৌকা ধ্বংস করে ব্যবসা বাণিজ্য অচল করে দিয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষ লাগবার পর ভারত সরকার বাঙলা থেকে অন্যত্র নেয়া চাল ফেরৎ আনেনি। নাযিম সরকারের দোষের মধ্যে ছিল দুর্ভিক্ষাবস্থার পূর্বাভাস পেয়ে সাবধান না হওয়া। জনসাধারণকেও তারা

সাবধান করেননি। খাদ্যাভাব অনিবার্য জেনেও বলেছেন, অভাব নেই। অনাহারে লোক মরবার খবর স্বীকার না করে মাঝে মাঝে উল্টো বলেছেন, অতিভোজনের দরুন পেটের পীড়ায় মরেছে। তাছাড়া ব্যর্থতা সত্ত্বেও গদী আঁকড়ে থাকা তাদের অপরাধের পর্যায় পড়ে।[৬৭] শস্যহানিও অবশ্যি দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী ছিল।[৬৮] আসলে "Both man and God joined hands to produce the tragedy in Bengal. The famine might be called, more man made than an act of God. But man merely exploited the situation created by Nature and War."[৬৯]

সংবেদনশীল কবি-শিল্পীগণই কলমে—তুলিতে দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছিলেন। শিল্পী জয়নুল আবেদীন তাঁর অমর স্কেচ-সমূহ এঁকেছিলেন দুর্ভিক্ষ ভিত্তি ক'রে। তাঁর অভিনব 'ম্যাডোনা'—যেখানে সুন্দর মা ও ছেলের বদলে কঙ্কালসার মাতৃত্ব দেখানো হয়েছে—এ সময়েই অংকিত হয়েছিল। ফররুখ আহমদ 'লাশ' নামক একটি কবিতায় পথের পাশে মানুষের লাশ পড়ে থাকা প্রসংগে লিখেছিলেন—

পড়ে আছে মৃত মানবতা
তারি সাথে পথে মুখ গুঁজে।[৭০]

আর এ সময় আবুল মনসুর আহমদ লিখেছিলেন ব্যঙ্গগল্প। তাঁর গল্পসমূহে দুর্ভিক্ষের চিত্রের সাথে দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী মানুষরূপী জানোয়ারদের চিত্র; মৃত মানবতা ও চেতনায় দুর্ভিক্ষের চিত্র পাওয়া যাবে। গল্পগুলো হচ্ছে 'ফুড কনফারেন্স' 'গ্রো মোর ফুড' লঙ্গরখানা, রিলিফ ওয়ার্ক', সায়েন্টিফিক বিজিনেস ইত্যাদি।

দুর্ভিক্ষ তাড়িত জনতার ঢল নেমেছে কলকাতায়। সাধারণ লোকগুলো বড়লোকদের গায়ে পড়ে প্রায়। মূলতঃ সাধারণ জনগণের সংস্পর্শ থেকে বাঁচবার জন্য 'ফুডকনফারেন্স' ডাকা হল। সভাপতি শেরে বাঙলা। উভয় পাশ ঘেঁষে 'সিংগীয়ে বাঙলা,' 'মহিষে বাঙলা,' 'গরুয়ে বাঙলা,' গাধা-এ বাঙলা' প্রমুখ ছোটবড় নেতা। উদ্বোধনী ভাষণে সভাপতি শেরে বাঙলা খাদ্যের অভাবের কারণস্বরূপ তাঁর কাছ থেকে অকৃতজ্ঞ জাতির গদি কেড়ে নেয়ার ওপর জোর দিলেন। সিঙ্গীয়ে বাঙলা বললেন, কোয়ালিশন সরকার গঠন করলে খাদ্যসমস্যা এড়ানো যেত। গাধায়ে বাঙলা বললেন—যতদিন শেরে বাঙলার দল ক্ষমতায় ছিলেন ততদিন কোয়ালিশনের প্রশ্ন ওঠেনি। আমরা গদি ছাড়বো না। গদিতেই মরবো। সভায় গোলমাল। মহিষে বাঙলা আপোষ প্রস্তাব করলেন—ফুডকমিটি করে সদস্যদের মন্ত্রীর পদমর্যাদা দেওয়া হউক। প্রস্তাব গৃহীত হল এবং নেতাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হলো। জাতীয় নেতাদের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের পুণ্যদিনের স্মৃতিস্বরূপ গাধায়ে বাংলা

গ্র্যান্ড হোটেলে প্রীতিভোজের প্রস্তাব দিলেন। হোটেলে ফুড কমিটির কাজ শুরু হল। খাদ্যসমস্যার কারণস্বরূপ কোন কোন বস্তা দায়ী করলেন—মুসলমানদের পাকিস্তান দাবীকে, কেউবা দায়ী করলেন সরকারী যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কংগ্রেসী স্যাবোটাজকে। কেউ কেউ বললেন, জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে সত্য কিন্তু ওটাকে দুর্ভিক্ষ সমস্যা বলা যাবে না; কেননা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মানুষের সমৃদ্ধির পরিচায়ক। কেউবা বললেন, মানুষ অনাহারে নয়, পেটের অসুখে মারা যাচ্ছে। সমাধানের জন্য পাঁচটি স্কীম নেয়া হলো। শেষ স্কীমটি ছিল উল্লেখযোগ্য—খোরাকির পরিমাণ অনুসারে খানেওয়ালার সংখ্যা কমাতে হবে। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। খেয়ে সকলে ঘুমালেন এবং অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখলেন। অনেক পরে জেগে দেখতে পেলেন, স্কীমের বদৌলতে দেশের সকল লোক মারা গেছে। আবার পথেঘাটে পরীর মেলা—গরীবদের ভীড় নেই। সকলের চোখেমুখে আনন্দ। হঠাৎ ছাগলে বাঙলা বললেন—শুধু জানোয়ারে বাঙলারাই আমরা বেঁচে রইলাম। মানুষে বাঙলারা যে সবাই মরে গেল।[৭১] ফুডকনফারেন্সের কাহিনী মোটামোটি এ রকম। গল্পটিকে প্রায় রূপক বলা যেতে পারে। শেরে বাঙলা, গাধায়ে বাঙলা প্রমুখের উক্তি থেকে দুর্ভিক্ষামলের বিভিন্ন মন্ত্রীসভার সদস্য এ. কে. ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন প্রমুখকে সহজে সনাক্ত করা যায়। গল্পটিতে একটি চমৎকার রূপক সৃষ্টির সুযোগ ছিল এবং লেখক কিছুটা কাজেও লাগিয়েছেন। পৃথিবীর সাহিত্যে পশু-কাহিনী পর্যায়ের একটি উৎকৃষ্ট রূপক জর্জ অরওয়েলের এনিম্যাল ফার্ম (১৯৪৫)। এনিম্যাল ফার্মের বক্সার, ক্লেভার, মলি প্রমুখ চরিত্রগুলো সকলের পশু এবং পশুর মতই আচরণ করেছে। কিন্তু তাদের উক্তি থেকে রূপকার্থ অর্থাৎ একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের তথাকথিত সংগ্রামের কথা বেরিয়ে পড়েছে। 'ফুডকনফারেন্স' গল্পের চরিত্রগুলো বর্ণনায় অনেকটা পশু হলেও আচরণে পশুর মত মনে হয়নি। গল্পটির প্রথম অধ্যায় থেকেও লেখকের রূপক সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। প্রথম অধ্যায়ে লেখক পশুদের কন্‌ফারেন্স না বলে বড়লোকদের কনফারেন্স বলেছেন। বড়লোক আর পশুতে তিনি হয়তো তফাৎ খুঁজে পাননি। সে যাই হোক, গল্পটিতে অনেকের ওপর ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। মূলতঃ তাদেরই ব্যঙ্গ করা হয়েছে—যাদের কাছে জনগণের ফুড সমস্যার চাইতে নিজেদের মন্ত্রীত্বের সমস্যা অধিকতর জরুরী তাদের কার্যকলাপ থেকে বার বার মনে হয়েছে তারা দেশের খাদ্যসমস্যার চাইতে নিজেদের খাদ্য সমস্যা নিয়ে বেশী ব্যস্ত। কনফারেন্সের অন্যতম উদ্দেশ্যকেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে গল্পে। কনফারেন্স ডাকা হয়েছিল—মৃতপ্রায় লোকদের প্রতি ভালবাসার কারণে নয়—তাদের রক্ষার জন্যও নয়—গ্রামের লোকদের ভীড়ে এবং ভিক্ষা দাও চিৎকারে অসুবিধে হচ্ছিল ব'লে। "অফিসে-আদালতে, থিয়েটার

বায়োস্কোপে স্বাধীনভাবে চলাফেরা একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কাজেই এর প্রতিকারের জন্য একটা কিছু করতেই হবে। সেটা কি? ভদ্রলোকেরা বরাবর যা করে থাকেন, তাই। করাও হল তা। অর্থাৎ সভা ডাকা হল।[১২] সেমিনারই জাতির মেরুদণ্ড বলে একটি ব্যঙ্গোক্তি মাঝে মাঝে শোনা যায়। এদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর সেমিনার-সভাসম্মেলন প্রীতিকেও এ গল্পে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। রোম যখন পোড়ে তখন নীরোর মত অনেককেই বাঁশী বাজাতে দেখা যায়। বাঙলার মানুষ যখন লাখে লাখে মারা যাচ্ছিল, তখন চলছিল গ্র্যান্ড হোটেলে প্রীতিভোজ। নেতাদের নীরব ভূমিকা পালনকে যেমন ব্যঙ্গ করা হয়েছে এ'গল্পে তেমনি ব্যঙ্গ করা হয়েছে অজ্ঞসুলভ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তিকে।' এই ধরুন, আমরা যে এই হোটেলে খানিক পরেই খেতে বসবো, তার দাম ছিল আগে মিল প্রতি পাঁচ টাকা, কিন্তু আপনারা যে খানা খাবেন তার দাম মিল প্রতি দশ টাকা। তবে কি বুঝতে হবে গ্র্যান্ডহোটেলে খাদ্যসমস্যা দেখা দিয়েছে? তা নয়। বরঞ্চ বুঝতে হবে, আমরা যারা এই হোটেলে খানা খেয়ে থাকি, তাদের অবস্থা সচ্ছল হয়েছে।'[১৩] নেতাদের অজ্ঞতার আরেকটি নিদর্শন নেয়া যাক, "হাসপাতালে কিছু লোক মারা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তারা অনাহারে মারা যাচ্ছে কি বেশী খেয়ে পেটের পীড়ায় মারা যাচ্ছে, তার কি কেউ খবর নিয়েছেন?"[১৪] ১৯৪৩ এর মন্ত্রীসভার সদস্যদের এ'জাতীয় বক্তব্য আগে উদ্ধৃত হয়েছে। একটু মিলিয়ে পড়লে ব্যঙ্গের তীব্রতা সহজেই বোঝা যাবে।

'গ্রো মোর ফুড' গল্পে 'গ্রো মোর ফুডে'র কর্মকর্তাদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কর্মকর্তারা অধিক ফসল ফলানোতে মোটেও উৎসাহী নয়—কেননা ফসল ফলানোর অভিযান সফল হ'লে 'গ্রো মোর ফুড' কর্মসূচী থাকবে না এবং তাদের চাকরীও থাকবে না। নেতারা তাহলে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে গ্রো মোর ফুড কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন? কি প্রয়োজন ছিল তাদের? "কিন্তু প্রয়োজন দেখা দিল। ভারতবাসীর জানের জন্যই জান বাঁচানোর দরকার হোক আর না হোক, লড়াইর জন্য দরকার।"[১৫] তৎকালীন নেতৃবৃন্দ ও বিদেশী শাসকদের বিভিন্ন কর্মসূচীর মুখোশ এভাবে উন্মোচন করে দিয়েছিলেন আবুল মনসুর আহমদ।

দুর্ভিক্ষকালে গ্র্যান্ডহোটেলের প্রীতিভোজ প্রসঙ্গে নেতাদের নীরোর ভূমিকা পালনের কথা বলা হয়েছিল আগে। আসলে দুর্ভিক্ষ নিয়ে ব্যবসাও চলছিল পুরোদমে দেশসেবার এ'টে। দুর্ভিক্ষকালের সেবার মুখোশ উন্মোচনকারী একটি গল্প, লঙ্গরখানা। দুর্ভিক্ষের সময় লোকদেখানো লঙ্গরখানা খুলে পেছনের দরজা 'ওপেন' করে দিয়ে অনেক ব্যক্তি ধনী হয়ে গিয়েছিল। আকবরের বন্ধু শমসের ছিল তেমনি একজন ব্যক্তি। লঙ্গরখানা খুলে কাগজে কলমে সে প্রতিদিন প্রচুর লোককে খাওয়াচ্ছিল আর সব চাউল পাচার ক'রে

দিচ্ছিল পেছনের দরোজা দিয়ে হিসেব করতে গিয়ে দেখা গেল, কলকাতায় যত লোক আছে তার দ্বিগুণ লোককে প্রতিদিন খাওয়াচ্ছে শমশের।

"ওযির: আমি হিসাব করিয়া দেখেছি, কলকাতামে যেতনা লোক আছে, তোমরা তার ডবল লোককে খেলাইতে আছে। এটা কেমন করিয়া হৈতে পারে?···আগার তোমার বাত সাচভী আছে, তবভী কলকাতার সব লোক লঙ্গরখানামে খানা খাইতে যায় না।

শমশের: ভদ্রলোক কাকে বলছেন হুজুর জানি না। তবে আপনার আইন সভার এম. এল, এরা প্রায় সবই লংগরখানায় খেতে যান। তাঁরা বলেন: সরকারী টাকায় খানার বন্দোবস্ত হয়েছে, তোমরা না দেবার কে?[১৬] এত কিছু সত্ত্বেও অনাহারে লোক মরতে থাকল। প্রায় সব লোক মরে গেলে উজির সাহেব সভা ডাকলেন "উজির: তোম লোক দেশের সব মানুষ মারিয়া ফেলিয়াছে...আর হাম লাট সাবকো ক্যা কৈফিয়ৎ দিবে?···আকবর: আপনার কাজ আপনি করেছিলেন·····লোকগুলো বাঁচল না তাদের হায়াত ছিল না বলে। দুনিয়াটা মুসাফিরখানা বইত নয়। শমশের: তাছাড়া আমরা খুব ধুমধামের সঙ্গে দাফন ও সৎকার করেছি। লাশের প্রতি কোন অসম্মান হতে দিই নি। নিশ্চয় ওরা সব স্বর্গে ও বেহেশতে গিয়েছে। ওযির: বহুত আচ্ছা করেছ 'তাদের ভালই করেছ' লেকেন দেশের লোক যে মরে গেল, আমারে ভোট দিবে কে? কার ভোটে আমি আয়েন্দাতে ওযির হব?[১৭]

আবার সেই একই প্রসঙ্গে ফিরে এলেন আবুল মনসুর আহমদ। দুর্ভিক্ষের কালে মানুষকে বাঁচাবার জন্য প্রকৃত চেষ্টা নেতাদের মধ্যে কারো ছিল না বলা চলে। কেউ ব্যবসার প্রয়োজনে, কেউ যুদ্ধের প্রয়োজনে আর কেউবা ভোটের প্রয়োজনে এ'দেশের মানুষকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। চেতনার দুর্ভিক্ষের কথা আগে বলা হয়েছে, আবুল মনসুর আহমদ দুর্ভিক্ষের গল্প সমূহে দুর্ভিক্ষামলের ক্ষমতাবানদের চেতনার দুর্ভিক্ষকেই ব্যঙ্গ করেছেন।

দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে বাঙালীর অসৎ ব্যবসায় বুদ্ধিকে ব্যঙ্গ ক'রে লেখা অতি উৎকৃষ্ট গল্প 'সায়েন্টিফিক বিযিনেস'। এ গল্পে ব্যবসার নামে ফটকাবাজি, ভেজাল প্রবণতা এবং ঘুষ খাওয়াকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। গালিভার্স ট্রাভেলস' এর চতুর্থ খণ্ড পড়ে জোনাথন সুইফটকে অনেকে মানব বিদ্বেষী ভেবেছিলেন—সায়েন্টিফিক বিযিনেস পড়ে আবুল মনসুর আহমেদকে কারো কারো কাছে বাঙালী-বিদ্বেষী মনে হতে পারে। কিন্তু একটু মনোযোগে পড়লেই গল্পটিতে লেখকের হাসির পেছনে কান্না এবং ঘৃণার পেছনে ভালবাসার সন্ধান পাওয়া যাবে। ব্যবসায়ে অনিচ্ছুক

জাতি কিভাবে ব্যবসায়ে নেমে ভেজাল চোরাকারবারী ও ঘুষ খাওয়াকে সায়েন্টিফিক পন্থা হিসেবে ভেবেছিল এবং অন্যায় ব্যবসায় করে, দুর্ভিক্ষ এনে দেশের সব লোককে মেরে পরকালে নিজেরাও কি কঠোর শাস্তি লাভ করেছিল, তারই পরিচয় পাওয়া যাবে গল্পটিতে। গল্পকার ধরে নিয়েছেন বাঙালী জাতি আর কেউ বেঁচে নেই। তারপর নিশ্চিহ্ন বাঙালী জাতির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। বাঙালী জাতটা ভালই ছিল। কেরানি-চাপরাশির চাকরী ছাড়া কিছুই বুঝতো না। আশ্চার্য প্রফুল্লচন্দ্র কৌশলে দেশ সেবার নামে তাদেরকে বিযিনেসে নামানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিযিনেসে নেমে তারা ফটকাবাজি, ভেজাল ব্যবসা ও ব্যবসার নামে ঘুষে মন দিয়েছিল। সরকার মূল্যে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে জিনিস গায়েব হয়ে গেল। ফলে দুর্ভিক্ষ নেমে এল এবং সব লোক মারা গেল। মরে গিয়ে তারা নিস্তার পায়নি। অভিনব তেজারতি করে সমস্ত বাঙালী জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার কারণে আল্লাহ্ তাদের নরকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু হক সাহেবের ওকালতিতে তারা বেঁচে গেল। কেরানিগিরি-চাপরাশিগিরি ছাড়া তারা বাঁচবে না বলে তাদের বেহেশতের কেরানি-চাপরাশি করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও তারা দোযখীদের কাছে গোপনে বেহেশতের পারমিট বিক্রি করতে শুরু করলো। ধরা পড়বার পর শাস্তির উদ্যোগে নিলে পুনর্বার অনুরোধ জানানো হলো দোযখের কেরানি চাপরাশি করবার জন্য। কিন্তু আল্লাহতায়ালা বিশ্বাস না করে তাদের হাবিয়া দোযখে মাটি চাপা দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং যেখানে যেখানে বাঙালী জাতি বাস করেছিল সেসব জায়গায় রিচিং পাউডার ছিটিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এবারে সায়েন্টিফিক বিযিনেসের কয়েকটি নমুনা দেয়া যাক্। 'নরেন বলল...হাসপাতালের সাপ্লাই দিয়ে রোজ তিন চারশো টাকা লাভ করতে যে উপদেশ আপনি আমায় দিলেন, সেটা আমি কন্ট্রাকটরি না করেও করতে পারি। আমি যদি রোগীর পথ্য কমিয়ে দি...আর সাপ্লাই করা সব জিনিস পিছনের দরজা দিয়ে বিক্রি করে দি' তবে হিসেব করুনতো কত টাকা থাকবে।[৭৮] অন্যত্র আজিজ একটি কথার জবাবে বলেছিল কণ্ট্রাকটারি করা আমাদের পদমর্যাদার হানিকর।...কেন করব? কণ্ট্রাকট বিলি করেই তো ঢের রোযগার করতে পারব।[৭৯] এদের কথা শুনে ভুড়িওয়ালা বলেছিল...ধন্য বাঙালী কা মগজ।[৮০]

সত্যি সত্যি বাঙালির ঐ মগজের প্রশংসা নাকরে উপায় আছে কি? যারা 'হিন্দু সভার' সাইনবোর্ড দিয়ে সৈন্য রিক্রুটের বিযিনেস করে; 'কৃষক সভার' সাইনবোর্ড দিয়ে ব্যাংকিং ব্যবসা করে অথবা যারা গোরক্ষা কমিটির সাইনবোর্ড

দিয়ে চামড়ার বিযিনেস করে—আবুল মনসুর আহমদ তাদের সকলকে আগা-গোড়া ব্যংগ করেছেন। চমৎকার ব্যংগ জমে উঠেছে তখন—যখন বাঙালি আল্লাহর কাছে বল্ল—কিন্তু কেরানি-চাপরাশির জাত আমরা কেরানি চাপরাশিগিরি ছাড়া বাঁচবো না। আমাদের তুমি দয়া করে দোযখের কেরানি-চাপরাশি করে দাও।[৮১] এ ব্যংগের পেছনে যে কান্না আছে তা গল্পকে অনেক উঁচু স্তরে নিয়ে গেছে।

আবুল মনসুর আহমদ আর কোন গল্প না লিখে শুধু সায়েন্টিফিক বিযিনেস লিখলেই বাঙলার ব্যংগসাহিত্যে স্থান করে নিতে পারতেন। আবুল মনসুর যে কতবড় হাস্যরসিক ছিলেন, তার প্রমাণও এ' গল্পে প্রচুর। গল্পের শুরুটাই শোনা যাক প্রথমে। "বাঙালী জাতটা ছিল একটা প্রতিভাশালী জাত। তবে তাদের দোষের মধ্যে মস্ত দোষ ছিল, তারা চাকুরী ছাড়া আর কিছু বুঝত না।.....সেক্সপিয়ার মিল্টন মুখস্ত করে বি. এ., এম. এ. ডিগ্রী নিত। তার পর ত্রিশ টাকা মাইনের কেরানিগিরি পেত···এতেও হাত সাফাই দেখতে না পারলে.....তাদের ভবিষ্যৎ নিজেদের মতই ঝরঝরে করবার চেষ্টা করত অর্থাৎ মাষ্টারি করত।[৮২] মনসুরের বর্ণনাতেও হাসির উপাদান। "এমন সময় একটা ভুড়ির ধাক্কায় স্প্রীং-এর হাফডোরটা ফাঁক হয়ে গেল। দেখা দিল ভুড়িওয়ালা।[৮৩] ভুড়িওয়ালার ভাষা শুনলেও হাসি পায় "আচারিয়া পরফুল দেবনে আজ বহুত উমদা তক্‌রির করেছেন। আপনে লোগ্ গেলে আলবত খুশী হৈতেন।.....কহলেন সব হক কথা। এই বাংগালীলোক খালি নওকরি নওক্‌রি করে, বিয়নেসকে তরফ খেয়াল করেনা"।[৮৪] চমৎকার কৌতুক পরিবেশন করেছেন আবুল মনসুর, যখন তেজারতির কুমতি দানের জন্য ফেরেশতারা ছুটলো আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রকে ধরে আনতে। আচার্যদেব নিশ্চিত মনে বেহেশতের একবাটি শরাবন তহুরা নিয়ে দুঃখের আগুনে তাই জ্বাল করে অক্সিজেন-হাইড্রোজেনের খেলা দেখ্‌ছিলেন; এমন সময় ফেরেশতারা তাঁকে ধরে হাতে-পায়ে টেনে হেঁচড়িয়ে হাশরের ময়দানে নিয়ে এলেন।[৮৫]

লবণ সঙ্কট

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পূর্ববাঙলায় লবন সংকট একটা চরম আকার ধারণ করেছিল। এই সংকটকালে লবণের দর ক্রমাগতভাবে ওপরের দিকে ওঠা শুরু করে শেষ পর্যন্ত সেরপ্রতি ষোল টাকায় দাঁড়িয়েছিল। খাদ্য সংকট দেখা দিলে যেভাবে মানুষ বিপদগ্রস্ত হয় সেভাবে বিপদগ্রস্ত না হলেও এই সংকটের ফলে সাধারণ মানুষের বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের কষ্ট দারুণভাবে বৃদ্ধি

পেয়েছিল।[৮৬] ঢাকা শহরেও লবণ সংকট প্রকট হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন বৃহত্তম ছাত্রাবাস সলিমুল্লাহ হলের খাদ্যতালিকা পরিবর্তন করে ছাত্রদেরকে দই সহযোগে ভাত খেতে দেয়া হচ্ছিল।[৮৭] লবণের মধ্যে হাড়ের গুঁড়ো এমন কি চিনি পর্যন্ত ভেজাল দেওয়া হচ্ছিল।[৮৮]

লবণ সংকট সম্পর্কে তৎকালীন সরকারও অবহিত ছিলেন। কিন্তু সংকট সমাধানে ব্যর্থতার মূলে ছিল তৎকালীন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব—একে অন্যের ঘাড়ে সংকটের দায়িত্ব চড়ানোর চেষ্টা।[৮৯]

লবণ সংকট সমাধানে সরকারের ব্যর্থতা ও সংকট সমাধানে অপচেষ্টাকে ব্যংগ করে লিখিত হয়েছিল 'নিমক হারাম' (ভাদ্র, ১৩৫৯) গল্পে সরকার প্রচলিত প্রবচনের নিমকহারাম শব্দ সমষ্টিকে টুইষ্ট ক'রে অপব্যাখ্যা করলেন—নুন মানুষের জন্য হারাম। এক মুফতীর মাধ্যমে তারা জানালেন হাদীস শরীফে আছে নিমকহারাম। তাছাড়া, মুফতি নিমক না খাওয়ার ফযিলত প্রমাণ ও প্রচার করলেন। ঘোষণা করলেন, যে লবণ না খাবে (১) তার বাড়ীতে চুরি হইবে না, (২) তারে কুত্তায় কামড়াইবে না, (৩) তার চুল দাড়ি সাদা হইবে না ও দাঁত পড়িবে না। কিভাবে সম্ভব? মুফতী সাহেব সরকারী ডাক্তারের মাধ্যমে জানালেন—নিমক না খেলে যক্ষ্মা হবে আর যক্ষ্মা হলে তাকে সারারাত জেগে জেগে কাশতে হবে। চোর আসবে কিভাবে? তাছাড়া, যক্ষ্মারোগীকে লাঠি হাতে চলতে হবে। হাতে লাঠি থাকলে কুত্তা কামড়াবে কি করে? সবশেষে যক্ষ্মারোগী বাঁচবে মাত্র পয়ত্রিশ—চল্লিশ বছর। এ সময়-কালে চুল-দাড়ি পাকবার কথা নয়। এতসব ফযিলতের কথা অবগত হয়ে সরকার জনগণের স্বার্থে লবণ অর্থাৎ নিমকের দাম না কমিয়ে নিমক হারাম ক'রে দিলেন। কিন্তু একবারও তারা ভাবলেন না, লবণ না হলে যক্ষ্মা হবার সম্ভাবনার কথা।

আগেই বলা হয়েছে, 'নিমক হারাম' গল্পে সরকারী ব্যর্থতা ও অপ্রপ্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে বিভিন্ন সময় সরকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সহজ পথে না গিয়ে অনাবশ্যক বাঁকা পথে যান; সংকট এড়াবার জন্য অপকৌশল অবলম্বন করেন। তাছাড়া তাড়াতাড়ি সমাধানের দিকেও সরকারের ঝোঁক থাকে। আপাততঃ লবণকে হারাম করা হলো কিন্তু জাতিকে যে যক্ষ্মার মুখে ঠেলে দেওয়া হলো সে চিন্তা কারো মাথায় এলো না। নিমক-হারাম গল্পে সরকারের ইত্যাকার সব কর্মকাণ্ডকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

আরো কিছু ব্যঙ্গের নমুনা নেয়া যাক।

১. "দেশ যে আর রক্ষা করা যায় না। তার মানে জনগণকে আর পক্ষে রাখা গেলো না।[৯১] তথাকথিত জননেতারা দেশরক্ষা বলতে বোঝেন গদি

রক্ষা। জনগণ পক্ষে না থাকলে গদি রক্ষা হবে না, এ ধরনের জননেতারা নিজের গতি আর দেশকে এক করে দেখেন। কেননা, তাদের মনোভাব অনেকটা এ'রকম—আমি গদিতে না থাকলে, দেশ থাকলেই বা কি না থাকলেই বা কি ?

২· "লবণের সের বড়জোর ৮।১০ টাকা হৈবার পারে, একেবারে ষোল টাকায় তুললেন কি কৌশলে ? এ ব্যঙ্গ দুধারী ছুরির মতো। চার পয়সার লবণ আট/দশ টাকা হলেও অপরাধ। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সে অপরাধের কথা চিন্তা করছেন না, তিনি ভাবছেন, লবণের সের ষোল টাকা হলেই মাত্র অপরাধ হয়। অজ্ঞতা আর কাকে বলে।

বিশ্বযুদ্ধ

অর্থনৈতিক ব্যঙ্গের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা ফুডকনফারেন্স গ্রন্থের 'মিছিল' গল্পটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে গল্পটি রচিত। যুদ্ধের মওসুমে কিছু ব্যবসায়ী টু-পাইস কামানোর মোক্ষম সুযোগ পায়। তাছাড়া, যুদ্ধের মওসুমে কিছু লোক নতুন নতুন নিযুক্তি—এমন কি পদোন্নতিও লাভ করে। ফলে যুদ্ধ থেমে গেলে এসব যুদ্ধের পোষ্যপুত্রবা দুঃখের অভিনব মর্সিয়া গেয়ে গেয়ে মাতম করতে থাকে। কেননা, যুদ্ধ অবসানে তাদের হঠাৎ আলোর ঝলকানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যুদ্ধের সন্তান ও পোষ্যদের তথাকথিত দুঃখকে ব্যঙ্গ ক'রে লেখা গল্প 'মিছিল', এদের তথাকথিত দুঃখের সাথে মডার্ণ ইবর্যাহিম গল্পের খান বাহাদুরী-হারানো-দুঃখের মিল আছে। 'মিছিল'-এর কাহিনী নিম্নরূপ। দুর্ভিক্ষের সময় ঈদের প্রাক্কালে হঠাৎ যেন এক মিছিলে শোনা গেল। 'হায় হোসেন', 'হায় হোসেন'। আসলে ওটা ছিল 'হায় জাপান', 'হায় জার্মান' মাতম। ছাতপেটার শব্দের মতই ছাতিপেটার শব্দ'[৯৩] গল্পের কথক ও পরেশ, জাপান ও জর্মানীর সমর্থক এতগুলো লোককে ঠকিয়ে দিয়ে প্রমোশন-পদবীর লোভে ইংরেজ-পুলিশকে জানিয়ে এলেন। গ্রেফতারের পর দেখা গেল, আসামীদের মধ্যে জার্মান-জাপানী কেউ নেই—তাদের বদলে চেম্বার অব মার্চেন্টের সভাপতি পাগড়ীওয়ালা ও অন্যান্যরা। আসামীদের উকিল বললেন, "আমার মওক্কেলদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রাজদ্রোহের।—কি কারণে কোন দুঃখে তারা 'হায় জাপান', 'হায় জার্মান' ব'লে বুকে ও কপালে করাঘাত করেছেন সেটা যদি হুজুর জানতে পারেন, তবে রাজদ্রোহের অপরাধে এদের জেলে না পাঠিয়ে এদের দুঃখে সমবেদনাই প্রকাশ করবেন।"[৯৪] দুঃখের কারণ ? আসামি পক্ষের উকিল বয়ান করলেন, যুদ্ধ বেঁধেছিল বলেই ব্ল্যাকমার্কেট হয়েছিল, মিলিটারী কন্ট্রাক্ট হয়েছিল...যারা ব্ল্যাকমার্কেট থেকে, মিলিটারী

কন্টাক্ট থেকে...টুপাইস রোজগার করেছেন, তারা জাপান ও জার্মানীর দৌলতেই করেছেন, এটা ঠিক কিনা?—যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ায় আমার এই মওক্কেলদের যে গুরুতর লোকসান হয়েছে, সেটা ইঅর অনার দেখতে পাচ্ছেন।—এখন তাঁরা 'হায় জাপান', 'হায় জার্মান' ব'লে রোদন করতে পারেন কিনা এ'কথা আমি 'ইঅর অনার'কেই জিজ্ঞেস করছি। ব্যঙ্গের এখানেই শেষ নয়, আসল ব্যঙ্গ জমে উঠল তখন—যখন দেখা গেল বিচারপতি স্বয়ং যুদ্ধের কারণে উকিল থেকে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন। বোঝা গেল তিনি এবং আরো অনেকেই যুদ্ধের সন্তান। ফলে, আসামিরাতো খালাস পেলই. উপরন্তু বিচারপতি সহ সমবেত সকলেই 'হায় জাপান', 'হায় জার্মান' মিছিলে যোগ দিলেন।

ট্যাকসের গান গাই

'ট্যাকসের গান গাই' প্যারডিটিকে অর্থনৈতিক ব্যঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। 'ট্যাকসের গান গাই' নজরুল ইসলামের 'নারী' অনুসরণে রচিত—সাম্যের গান গাই' অনুসরণে নয়। ১৯৬৫ সালে রচিত প্যারডিটিতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শোয়েব এবং প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী এম. এন. হুদাকে ব্যঙ্গ করার চেষ্টা করা হয়েছে—

কেন চেপে রের আয়ের ঠাকুরে মিথ্যা খাতার কঙ্কালে?
হাসিছে শোয়েব রাহুল পিণ্ডির নিভৃত অন্তরালে।
সেইখানে বসি গাহিছেন তিনি ট্যাকশের সামগান
সে বাঁশীর সুরে আমাদের হুদা তুলিছে ঐকতান।

বাজে ট্যাক্‌শের ঢোল
মহা-ট্যাক্‌শের মহাখাযানার আজি মহা-কল্লোল
ঊর্ধ্বে হাসিছে শোয়েব
নীচে গণ ক্রন্দন রোল।[১৬]

'ট্যাকশের গান গাই'তে ঢালাওভাবে করপদ্ধতিকে ব্যঙ্গ না ক'রে সুনির্দিষ্ট কিছু করারোপকে ব্যঙ্গ করলে ভাল হতো। এ' ধরনের প্রচেষ্টা নেই, তাও নয়। যেমন ঃ—

কে তুমি? ও, চাষী? মজুর? ফেরিয়াল ভিখারী? মিস্তি আরো
গম-ভুষিওয়ালা? চারচাকা ঠেলা? করে যাও যাহা পার।

বন্ধু যা কিছু হও—
পেটে পিঠে কাঁধে কোমরে যা-খুশী বোঝাও গাট্টি বস্তা

কুড়মুড় ভাজা, পিঁয়াজ-সুট্‌কি চানাচুর বিক্রয়
যা কর বন্ধু, দিতে হবে মোরে বার আনা অষ্টত্রয়।[১৭]

সাধারণ আয়ের লোকদের পেশার ওপরে করারোপ নিয়ে ব্যংগ যথার্থ হয়েছে। সুনির্দিষ্টতার অভাবে অন্য ব্যংগ জমেনি। তবে ট্যাক্‌শের গান গাইতে হাসির উপাদান রয়েছে প্রচুর। যেমন—

এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল ফলিয়াছে যত ফল
ট্যাক্‌শ দিয়াছে রূপ-রস তাও গন্ধ সুনির্মল।

তাজমহলের পাথরে দেখেছ মমতায-শাজাহান
ট্যাক্‌শ-খাজনা না হইলে উহা কে করিত নির্মাণ।[১৮]

অবশ্যি, গরীবের ট্যাক্‌শ দিয়ে তথাকথিত স্থাপত্যের নিদর্শন স্থাপনকে ব্যঙ্গ হিসেবে এ' অংশকে ধরা যেতে পারে। এ' অংশ প্যারডি হিসেবেও চমৎকার 'মূলের সাথে মিলিয়ে পড়া যাক—

এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল
নারী দিল রূপ রস মধু গন্ধ সুনির্মল।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ ?
অন্তরে তার মোমতাজ নারী বাহিরেতে শাজাহান[১৯]

ধর্মীয় ব্যঙ্গ

দাঙ্গা

রাজনৈতিক ব্যঙ্গ আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বশর্ত ছিল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাবিধ কলহ। কলহ সমূহের মধ্যে ধর্মীয় কলহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ধর্মীয় কলহ বহু সময় দাংগা পর্যন্ত গড়িয়েছে। দাংগা সমূহের মধ্যে ১৯২৬ এর দাংগা ও ১৯৪৬ এর কলকাতা বিহারের দাংগা সব দাংগাকে ছাড়িয়ে গেছে। ১৯২৬ সালে রাজ রাজেশ্বরী মিছিলের বাজনা নিয়ে কলকাতায় তৎকালের বৃহত্তম দাংগা হয়। উভয়পক্ষে এগারশত লোক হতাহত হয়। একদিকে মসজিদের সামনে বাজনার দাবীতে হিন্দুরা উগ্র হয়ে ওঠে, অন্যদিকে মসজিদের সামনে বাজনার বিরুদ্ধে মুসলমানরা প্রবল আন্দোলন শুরু করেন। মুসলমানদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন স্যার আবদুল করীম গযনবী প্রমুখ। অন্যদিকে মসজিদের সামনে বাজনার দাবিতে বরিশালের জনপ্রিয় হিন্দুনেতা শ্রীযুক্ত সতীন সেন প্রমুখ প্রসেশন করতে যান। কুলকাঠি থানার পোনাবালিয়া গ্রামে পুলিস-মুসলমানে সংঘর্ষ হয়। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্লাণ্ডির নির্দেশে মুসলমানের উপর গুলি করা হয়। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে।[১০০] ১৯৪৬ এর আগষ্ট-অক্টোবর-নভেম্বর কলকাতা-বিহার সাম্প্রদায়িক দাংগার ব্যাপারে একই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ যুদ্ধ চলে প্রায় চার মাস ধরে। হতাহতের সঠিক তথ্য দুর্লভ। আবুল মনসুর আহমদ এক জায়গায় লিখেছেন, 'উভয়পক্ষে কত লোক যে হতাহত ও কত কোটি টাকার সম্পত্তি যে ধ্বংস হইয়াছিল, তার লেখাজোখা নাই'।[১০১] বিহার দাংগায় মুসলিম লীগের হিসেবে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার, হিন্দু চরম পন্থীদের হিসেবে দুই থেকে তিন হাজার এবং ইংরেজদের হিসেবে সাত থেকে আট হাজার মুসলমান নরনারী ও শিশু নিহত হয়।[১০২]

দাংগা সমূহের মূল কারণ কি কি ছিল? ১. একপক্ষের ধর্মীয় আচার পালনে অন্য পক্ষের আপত্তি। আচার-আচরণের মধ্যে মসজিদের সামনে বাদ্য বাজনা, গরু জবাই করা, হিন্দু এলাকায় আযান দেওয়া উল্লেখযোগ্য ছিল, ২. মুসলমান সম্প্রদায় দাংগা করেছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বুর্জোয়া প্রতিযোগিতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য[১০৩] ৩. ইংরেজদের চক্রান্ত—divide and rule ইত্যাদি। "নিজেদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভক্তির কাজকে সহজ

এবং ত্বরান্বিত করার জন্য ভারতবাসীর চেতনায় যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল, সে বিভ্রান্তি দাংগার মাধ্যমেই তারা সৃষ্টি করেছিল সম্পূর্ণ এবং চরমতম-ভাবে। এর ফলে তারা যে শুধু ভারতবর্ষকে ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত করল তাই নয়। তারা বিভক্ত করলো বাংলাদেশ। বিভক্ত এবং বিধ্বস্ত করলো পাঞ্জাব। তারা বিভক্ত করলো কাশ্মীর, এবং তার মাধ্যমে আজ পর্যন্ত পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতাকে রাখলো অনির্বাণ।[১০৪]

চিন্তাবিদ আবুল মনসুর আহমদ সাম্প্রদায়িক দাংগার কারণ সমূহ কমবেশী ধরতে পেরেছিলেন—সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন—এ' নৃশংসতার গভীরতা 'ছয়চল্লিশ সালের চোখের দেখা অমানুষিক নৃশংসতা আজও ঝলমলা মনে আছে। মনে হইলেই সজীব চিত্রের মতই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। গা কাঁটা দিয়া উঠে। স্বাভাবিক হৃদয়বান ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃতি হইবার কথা।...সত্যই এই সময় কলিকাতার বেশীর ভাগ মানুষ তাদের মনুষ্যত্ববোধ হারাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। একটা সংক্রামক ফ্রেন্যিতে যেন সবাই সমবেতভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।"[১০৫]

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর, গো দেওতা কা দেশ' ও 'ধর্মরাজ্য' গল্পে মনুষ্যত্ববোধ হারানো মানুষদের এঁকেছেন। পশু বাঁচাতে, মসজিদ মন্দির এলাকায় বাজনা বাজাতে ও আযান দিতে গিয়ে মানুষ নামের যে-সব পশুরা মানুষ হত্যা করেছিল তাদের ব্যঙ্গ করেছেন এবং সে সাথে ব্যঙ্গ করেছেন নীরব ভূমিকা পালনরত ইংরেজদের। গল্পগুলো মূলতঃ ২৬ এর দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত।

'গো দেওতা কা দেশ' (গো দেবতার দেশ) মূলতঃ গরু বাঁচাবার জন্য মানুষে মানুষে হানাহানির গল্প। অথ কুত্তা শিয়াল চরিতামৃতের মতো beast-fable tradition এ রচিত। গল্পটি পড়তে গিয়ে জোনাথন সুইফটের গালিভার্স ট্রাভেলস এর ল্যান্ড অফ দি হুইনমস অংশের কথা মনে পড়তে পারে। গালিভার জাহাজডুবির কারণে ল্যান্ড অব দি হুইনমস এ গিয়েছেন; গো দেওতা কা দেশ এর কথক নৌকাডুবির কারণে গো দেবতার দেশে গিয়েছেন। পরে জানা যায় কথকের নৌকাডুবি ঘটেছিল স্বপ্নে। গালিভার স্বপ্নের কথা স্বীকার করেননি। কথক নৌকাডুবির পর হঠাৎ ভেসে উঠে দেখলেন তিনি দুগ্ধসাগরে। তীরে উঠে দেখলেন, পাথরের দেশে শুধু দুধ আর গরু। কোন মানুষ নেই। একটি গাভী কথককে দেখে অবাক হল, কেননা তাদের হিসেবে কোন মানুষ বেঁচে থাকার কথা নয়। কিন্তু কথককে 'আনন্দ বাজার এর দেশ' এর লোক' অর্থাৎ বাংলাদেশের লোক শুনে আনন্দিত হলো; কেননা 'আনন্দবাজার' পত্রিকা তাদের রক্ষা করবার জন্য আন্দোলন করেছিল। কথক সে দেশে মানুষ আছে কিনা জানতে চাইলে

তাকে তাদের সর্দার অর্থাৎ বৃদ্ধ বলদের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। বলদও খুশী হল তাকে দেখে। কিন্তু অভিবাদন প্রত্যাভিবাদন কালে যখন বোঝা গেল কথক মুসলমান তখন অনার্য 'ম্লেচ্ছ' বলে চীৎকার করে উঠল। "গাভীটা আমার জাত গিয়াছে গো, মুসলমানটাকে আমি ছুঁইয়া ফেলিয়াছি। কাণীও ডুবিয়া গিয়াছে। হায়, হায়, আমি কোথায় গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব গো—বলিয়া সম্মুখের একটা পা কপালে ঠেকাইবার চেষ্টা করিয়া কাঁদিতে লাগিল[১০৬]। কিন্তু ষাঁড়গুলো শিং বাকিয়ে এগিয়ে আসছিল। সরদারের হস্তক্ষেপে কথক বেঁচে গেলেন এবং সাহস করে জানতে চাইলেন "আমি এ কোন দেশে আসিয়াছি'। বলদ জানাল—জায়গাটির নাম হিমালয়—ভারতবর্ষ দুধে ডুবে যাওয়ার কারণে তারা পর্বতে আশ্রয় নিয়েছে। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে বলদ জানাল—ভারতের সব মানুষেরা মরে গেছে কিভাবে? স্মৃতিচারণের ভংগীতে জানাল, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় বাস করত। মুসলমানরা হিন্দুর দেবতা গরুদের খেত। গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে আন্দোলন ও মারামারি করতে গিয়ে সব হিন্দু মুসলমান মারা গেল। অন্যদিকে গো-হত্যা বন্ধের কারণে গরুদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকল। মুশকিল শুরু হল দুধের টাটানিতে। নিরুপায় গার্ভীরা বিবিধ উপায়ে বাঁট ঘষে দুধ ফেলতে শুরু করল। এতে কালক্রমে খাল-বিল নদী নালা এমনকি সমস্ত দেশ ডুবে গেল। আনাচে কানাচে যে দু'চারজন মানুষ ছিল তারাও ডুবে গেল। সব গরু অনেক কষ্টে সাঁতরে পাহাড়ে উঠে ছিল কিন্তু পাহাড়ও ডুবতে বেশী বাকী নেই। আলোচনাকালে হঠাৎ দুধের বিরাট ঢেউ আসতে থাকলে বলদ লেজ তুলে দে'ড় দিল—কথক পুকুরায় ডুবে গেলেন। কথা বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে তার ঘুম ভেঙে গেল।

গরুকে বাঁচাতে গিয়ে দেশের অধিকাংশ মানুষের মৃত্যু কি মর্মান্তিক! এবং গরুর দুধে ডুবে বাকী মানুষের মৃত্যু কি হাস্যকর। প্রথম সাক্ষাতে বৃদ্ধ বলদ মানুষকে মানুষ হিসেবে বরণ করতে যাচ্ছিল কিন্তু বাদ সাধল ধর্ম—মুসলমানত্ব। ধর্মের আচার আচরণকে যারা মনুষ্যত্বের ওপর স্থান দিতে চান লেখক তাদের ব্যঙ্গ করেছেন এ গল্পে। সে সাথে ব্যঙ্গ করেছেন গো-রক্ষা আন্দোলনের সমর্থক ও প্রচারক আনন্দবাজার পত্রিকা ও দাঙ্গায় উস্কানী দাতা ডিভাইড-এ্যান্ড রুলের কুখ্যাত প্রবক্তা ইংরেজদের। ইংরেজদের ভেদ নীতির খেলা এ গল্পে চমৎকার ভাবে নগ্ন করে দেখানো হয়েছে। দেশের হিন্দু-মুসলমান যখন তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে রত তখন ইংরেজ হিন্দুদের ডেকে কানে কানে বুঝিয়ে দিল ইংরেজদের তাড়াবার অন্যতম কারণ যদি হয় তাদের গো-হত্যা, তাহলে সে গো হত্যা তো মুসলমানরাও করছে। ফলে হিন্দুরা দেশরক্ষার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছেড়ে গো-রক্ষার আন্দোলন শুরু করল। পরিণামে নিজেদেরও রক্ষা করতে পারল না। দাঙ্গায় ইংরেজ কি ভূমিকা পালন করল? "ইংরাজ

তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত থাকিল। সুতরাং খুব শান্তির সংগেই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হইতে থাকিল।"[১০৭]

কথকের গো দেবতার দেশে গমন—তাদের সাথে কথোপকথন বিশেষ করে গো-কুলের বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষা ব্যবহারের মধ্যে যথেষ্ট হাসির উপাদান রয়েছে। আসলে পুরো গল্পটি কৌতুক উপাদানে ভরা। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে।

১. বৃদ্ধ গাভী 'আনন্দবাজার সম্পাদকের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিবার জন্যে সামনের দুইটা পা কপালে ঠেকাইবার চেষ্টা করিয়া পড়িয়া গেল।'[১০৮]

২. দেখিলাম সর্দার একটা বৃদ্ধ বলদ। তার কপালে চন্দনের ত্রিশূল ও মাথায় টিকি আছে এবং একটা বনলতা সামনের দুপায়ের ভিতর দিয়া শরীর বেষ্টন করিয়া বুঝি বা পৈতার কাজ করিতেছে।[১০৯]

৩. তিন কোটি লাশ যখন একসংগে পচিতে আরম্ভ করিল, তখন তা হইতে অসহ্য গন্ধ বাহির হইল।
ইংরাজ নাক বন্ধ করিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। নাকে এসেন্সের ছিপি চব্বিশ ঘণ্টায়ই ঢুকাইয়া রাখিল।[১১০]

রাজরাজেশ্বরী মিছিলের বাদ্যবাদন ও মসজিদের সামনে বাজনার বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হয় 'ধর্মরাজ্য'। গল্পটি হিন্দু মুসলিমের ধর্মযুদ্ধের একটা বাস্তব চিত্র।[১১১] ১৩৩৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা সওগাতে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। 'গো দেওতা কা দেশ এর মত এ গল্পেও কথক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেছেন এবং ধর্মীয় আচার নিয়ে বাংগা ও ইংরেজদের ভূমিকা ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ করেছেন। হঠাৎ কথক শুনতে পান, হিন্দু মুসলমান ধর্মযুদ্ধে রত হয়েছে। সওয়াবের ভাগী হবার জন্য নিজেও ধর্মযুদ্ধে শরীক হলেন। "দুষ্ট হিন্দুরা পবিত্র মসজিদের সামনে দিয়া বাদ্য বাজাইয়া যাইবে, ইহাও কি আমাদিগকে চোখ মেলিয়া বরদাশত করিতে হইবে?"[১১২] যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে একদিকে 'হিন্দু ধর্ম কি জয়', অন্যদিকে 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি শুনতে পেলেন এবং খুশী হলেন। কারণ "আমি বুঝলাম: ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যখন এসব ধর্মভাব জাগরূক হইয়াছে, তখন স্বরাজ না হইবার আর কোন কারণ থাকিল না। কংগ্রেস-খেলাফত নেতারা এতদিন এই বস্তুটির অভাবের জন্যেই আফসোস করিতেছিলেন"[১১৩] এ উদ্ধৃতিতে বিশেষ করে শেষ বাক্যটিতে চমৎকার আয়রণি রয়েছে। কংগ্রেস-খেলাফত নেতারা জনগণের ধর্মভাব জাগরিত হউক কিংবা কিন্তু তার পরিণতি যে দাংগা পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে সেকথা

ভাবেননি। তাছাড়া, সান্ত্বনার বাণীর মধ্যেও সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের স্পর্শ রয়েছে—যে জাতি জাগতে চায়না ধর্মভাব জাগার মধ্যে হলেও জাগুক। তাহলে স্বরাজ পেতে হয়তো বিলম্ব হবে না। প্রসঙ্গত, কবি, নজরুল ইসলাম '২৬-এর দাঙ্গার প্রেক্ষিতে' যা শত্রু পরে পরে,' 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' প্রভৃতি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন। ১৩৩৩ এর আশ্বিনে লিখিত হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধে' তিনি লিখেছিলেন—

যে-লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির-চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া।

... ...

করুক কলহ জেগেছোতো তবু-বিজয়-কেতন উড়া।
করুক কলহ ! জেগেছেতো তবু !

যুদ্ধ ঘণ্টাখানেক চলল। "গোরা সার্জেন্টরা ঘোড়ায় চড়িয়া ধর্ম যুদ্ধে রত ভারতবাসীর স্বর্গ গমনের ধারা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।"[১১৪] অবশেষে সরকারকে আসতে হল। "অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সরকার হুকুম জারি করিলেন: যেসব জায়গায় মজিদের সংখ্যা খুব বেশী, সেই সব অঞ্চল মুসলমান-মহল্লা বলিয়া ঘোষিত হইবে; তথায় দুই-একটা মন্দির থাকিলেও সে অঞ্চলে মসজিদের সামনে বাদ্য বাজনা চলিবে না। পক্ষান্তরে, যে-সব অঞ্চলে মন্দিরের সংখ্যা খুব বেশী, সে সব অঞ্চল হিন্দু-পল্লী বলিয়া বিবেচিত হইবে; সেখানকার মসজিদের সামনে হিন্দুরা যত ইচ্ছা বাজনা বাজাইতে পারিবে। আর, সে-সময়টাতে মুসলমানরা নামায পড়িবে না, সেই সময়ে হিন্দুরা মুসলমান মহল্লার মন্দিরে গিয়া পূজা দিয়া আসিবে। এবং যে সময়টা হিন্দুদের পূজার সময় নয়, সেই সময়ে মুসলমানরা হিন্দু-পল্লীর মসজিদ সমূহে গিয়া আযান দিয়া আসিবে।"[১১৫] তারপর ? তারপর "আজব কাণ্ড ! কলিকাতার সেই বিরাট চৌতালা পাঁচতালা বাড়ির একটাও আর বাড়ি নাই, সবগুলিই মন্দির ও মসজিদ হইয়া গিয়াছে।.....সবাই যাহার তাহার কাজ ছাড়িয়া সেইসব মন্দির ও মসজিদে ননস্টপ পূজা করিতেছে এবং নামায পড়িতেছে।"[১১৬] কিধে পেলে কম-ধার্মিক লোকেরা কিছুক্ষণ-মুলতবীর প্রস্তাব দিলেন। এ'প্রস্তাব কার্যকরী হল না কেননা "কিছুক্ষণের জন্যে কোথাও উপাসনা বন্ধ করিলেই যে অপর পক্ষ তাহাদের মহল্লায় প্রবেশ করিয়া উপাসনা করিয়া যাইবে।"[১১৭] অবশেষে কথক ছাড়া সকলেই মারা গেলেন। লাট সাহেব এসে কথককে বললেন "বাঙালী জাতটা আজ ধর্মের জন্যেই প্রাণ দিল। ধন্য এ জাতি। আফসোস ! বড় লাট সাহেবের সংগে পরামর্শ করিতে করিতে দেরী হইয়া গেল। আর একদিন আগে আসিতে পারিলে এই মহান জাতির অন্ততঃ দু'একজন লোককে বাঁচাইতে পারিতাম।"[১১৮] দাংগার পেছনে ইংরেজদের চক্রান্ত ও দাংগা না থামিয়ে নিরাপদ দূরত্বে

অবস্থানকে আয়রনির মাধ্যমে লেখক এখানেও ব্যঙ্গ করেছেন। সবশেষে লাট সাহেব ধর্মরাজ্য লেখা সাইনবোর্ড লাশের মধ্যে পুঁতে দিলেন এবং দিকের রুমালে চোখ গাল এবং কপাল মুছে গুডবাই বলে চলে গেলেন। এত লাশের মধ্যে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে কথক পুনর্বার মূর্ছিত হলেন। দেখলেন ফেরেশতারা তাকে ধরে বেহেশতের মেওয়া খাওয়ার জন্য টানাটানি করছে। ফেরেশতাদের টানাটানিতে লেখকের ঘুম ভাঙল।

ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু ধর্মরাজ্যের অধিবাসীরা সবাই লাশ। জীবিত মানুষদের নিয়ে ধর্মরাজ্য তথা এক ধর্মের রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। চমৎকার ব্যঙ্গের মাধ্যমে লেখক তাও জানিয়ে গেলেন।

'ধর্মরাজ্য' গল্পে অধিক ধর্মপ্রাণতা, দাঙ্গায় ইংরেজদের নীরব-ভূমিকা পালন ইত্যাদিকে সাথে ব্যঙ্গ করার সাথে সাথে কৌতুক উপাদান রয়েছে প্রচুর।

১. আমি রাস্তা হইতে একটা লাকড়ি কুড়াইয়া লইয়া জনতার সহিত মিশিবার আশায় প্রাণপণে ছুটিলাম।[১১৯]

২. কলিকাতার সেই বিরাট চৌতালা পাঁচতালা বাড়ীর একটাও আর বাড়ী নাই, সবগুলিই মন্দির ও মসজিদ হইয়া গিয়াছে।[১২০]

৩. খুবই ঘুম পাইতে লাগিল, কিন্তু ঘুমাইয়া পড়িলে হিন্দুরা পাছে আবার বাদ্য বাজাইয়া যায় এই ভয়ে ঘুমাইলাম না। তাই বসিয়া বসিয়াই ঝিমাইতে লাগিলাম।[১২১]

একই ধর্মে কলহ ও ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ধর্মীয় দলাদলি

সুইফট তাঁর গালিভার্স ট্রাভেলস এর A Voyage to Lilliput অংশে Big-Endian এবং Little-Endian-দের সংঘর্ষ; সংঘর্ষে একজন রাজা ও এগারো হাজার লোকের মৃত্যু; বিতর্কের উপর সাতশত বৃহদাকার গ্রন্থরচনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। লিলিপুটে আহারের সময় ডিমের মোটা অংশের ভাংগার প্রথা ছিল প্রচলিত, শৈশবে ডিম ভাংগতে গিয়ে রাজার পিতামহ আংগুল কেটে ফেলেছিলেন, ফলে তৎকালীন রাজা ডিমের সরু অংশ ভাংগার নিয়ম প্রচলনের নির্দেশ দিলেন। জনগণ এ'নিয়মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। "The people so higly resented this Law, that our histories tell us there have been six rebellions raised on that account, wherein one emperor lost his life and another his crown. These civil commotions were constantly formented by the Monarchs of Blefuscu,..... [১২২]

ডিমের মোটা অংশ-পন্থী ও ছোট অংশ-পন্থীদের হাস্যকর সংঘর্ষের মাধ্যমে সুইফ্‌ট সমকালের ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ধর্মীয় দলাদলিকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। আবুল মনসুর আহমদের কিছু গল্পেও ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ধর্মীয় দলাদলিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। 'গোদেবতা' 'কা' দেশ 'ও' 'ধর্মরাজ্য' গল্পে গরু খাওয়া-না-খাওয়া, মসজিদের সামনে বাদ্যবাদন ও মন্দির এলাকায় আযান প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এসব দলাদলি ছিল ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে। 'নায়েবে নবী,' 'মুজাহেদীন,' 'লীড্‌রে কওম' প্রভৃতি গল্পে একই ধর্মাবলম্বী মুসলমানদের মধ্যে মত-পথের ও আচার-আচরণের ভিন্নতা ও তজ্জনিত সংঘর্ষকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এ গল্পগুলো মূলতঃ লেখকের কিশোর বেলার (১৯১০-১২)। হানাফী-মোহাম্মদী বিরোধের পটভূমিতে লিখিত। তৎকালে হানাফী-মোহাম্মদীর মধ্যে মাযহাবী বিরোধ, বাহাসের সভা, সভাশেষে মারামারি এবং পরিণামে মামলা-মোকদ্দমা ও জেল-জরিমানা ছিল সাধারণ ব্যাপার, মোহাম্মদীদের কারো কারো বক্তব্য ছিল "হানাফীরা হিন্দো-সে বদতর হ্যায়" এবং হিন্দুদের আগে তারা দোযখে যাবে। পক্ষান্তরে, হানাফীদের কারো কারো বক্তব্য ছিল অহানাফীরা মুসলমানই নয়।[১১৩]

প্রথমে নেয়া যাক 'নায়েবে নবী' গল্পটি। এ গল্পে একটি এলাকার দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী মাওলানার মধ্যে অশোভন সংঘর্ষকে দেখানো হয়েছে। মাওলানারা প্রকাশ্যে ধাক্কাধাক্কি করতে অথবা পরস্পরকে জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি করতে দ্বিধা করেননি। বিবাদের কারণ অবশ্যই ছিল ধর্মীয় কলহ। কিন্তু কি নিয়ে সে কলহের সূত্রপাত? বিষয়টি লিলিপুটের ডিমভাঙা বিতর্কের কাছাকাছি। গ্রামের মাতব্বর মারা গেছেন। মাওলানা সুধারামী দিয়েছেন মৃতের মাথা বরাবর দাঁড়িয়ে জানাযা পড়বার ফতোয়া আর মাওলানা গরিবুল্লাহ দিয়েছেন সিনা বরাবর দাঁড়িয়ে জানাযা পড়বার ফতোয়া। তারপর ধাক্কাধাক্কি এবং জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি। "সমবেত লোকেরা বহু কষ্টে জেহাদরত নায়েবে নবী-দ্বয়কে পরস্পরের বজ্রমুষ্টি হইতে মুক্ত করিল।"[১১৪] জনগণকে কলহ থেকে মুক্ত রাখবার জন্য মাওলানাদের অজানা এলাকায়—জনগণই তাদের পরস্পরকে কলহ থেকে মুক্ত করছে। জেহাদ করবার কথা মুসলমানের শত্রুদের বিরুদ্ধে, মাওলানারা জেহাদ করেছেন নিজেদের মধ্যে। জানাযার সিদ্ধান্ত দেওয়ার কথা মাওলানাদের। সিদ্ধান্ত দিলেন গ্রামের এক সাধারণ লোক! "সে বলিল, শির আর সিনা খুব তফাৎ নয়। পা একটু ফাঁক করে দাঁড়ালেই এক পা শির বরাবর আর এক পা সিনা বরাবর থাকবে। এতে উভয়ের মতই বজায় থাকবে।[১১৫] যেমন সমস্যা তেমনি সমাধান। কিন্তু জানাযার এমামতি করবে কে?" আর এমামতি কে করেন সেটা ঠিক হয় এমামের পাওনা দিয়ে। এমামের পাওনা উভয় মৌলবীর মধ্যে সমান ভাগ করে দেওয়া হোক, তাহলেই

উত্তরের এমামতি ঠিক থাকবে...মাতবর সাব মৌলবী সাবদের জিজ্ঞেস করলেন, কেমন ঐ ব্যবস্থা চলতে পারে? হাদীসের বরখেলাপ হবেনাত? নায়েবে নবীদ্বয় পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্তে দৃষ্টি বিনিময় করিলেন এবং প্রায় সমস্বরে বলিলেনঃ হাদীস শরীফে এ বিষয়ে কোন নিষেধ নাই।[১২৬]

শেষ পর্যন্ত থলের বেড়াল বেরিয়ে পড়ল। ধর্মীয় কলহের মূলে থাকে একশ্রেণীর মৌলভী-মাওলানার অর্থলোভ। দুই মাওলানা এলাকার নেতৃত্ব লাভের কলহে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় নেতৃত্ব লাভের প্রচেষ্টা ছিল সম্পূর্ণভাবে সাংসারিক স্বার্থ প্রণোদিত।

ছোট-খাট ধর্মীয় বিষয় নিয়ে মোল্লা-মৌলবীদের ব্যঙ্গ করা ছাড়াও, আবুল মনসুর আহমদ 'নায়েবেনবী' গল্পে মোল্লাদের বিবিধ নোংরামির মুখোশ উন্মোচন ক'রে দেখিয়েছেন। মোল্লাদের একাধিক বিয়ে প্রীতি, ভোজন-লালসা, অর্থলোভ, দেশ দুনিয়া সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি অনেক কিছু এ-গল্পে ঠাঁই পেয়েছে। ব্যঙ্গের ছুরির সাথে কৌতুক উপাদান মিছরির ভূমিকা পালন করেছে। ফলে ব্যঙ্গসমূহ পরিণত হয়েছে মিছরির ছুরিতে।

১. বিয়ে-প্রীতি—"কোথাও দীর্ঘদিন থাকিতে গেলে তথায় বিবাহ করা সুন্নত...তাই সুধারামী সাহেব সুন্নতের ইযযত রক্ষাও শয়তানের বদমায়েশির রাস্তা বন্ধ করিবার জন্য ঐ গ্রামের পুত্রহীন এক গৃহস্থের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সেখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।"[১২৭] কেবল সুন্নতের ইযযত রক্ষার ভাঁওতা ও গৃহস্থের একমাত্র কন্যা বিয়ের ব্যাপারটি লক্ষ্যযোগ্য।

২. খানাপ্রীতি—"(ওয়াযের) ভূমিকাতে ঘণ্টাদেড়েক কাবার হইল। বাড়িওয়ালা পিছন হইতে বলিয়া গেলেন, খানা তৈয়ার, সুতরাং মৌলবী সাহেব ভূমিকা হইতে সটান উপসংহারে চলিয়া গেলেন।[১২৮]

৩. অজ্ঞতা—"আর আজ কিনা ইংরাজি-পড়া এ'লোকের কাছে শুনতে পাই ইংরাজের বাদশাহি রুমের বাদশাহির চেয়েও বড়। হাদিস শরীফে রুমের সোলতানকে সারে জাহানের বাদশা বলা হয়েছে। ইংরেজেরা কি জাহানের বাইরে বাস করে? কোরানের কথা কি ঝুট হয়ে গেল? নাউযুবিল্লাহে বিন-যালেক।"[১২৯]

৪. অশোভন আচরণ—"সুধারামী সাহেব জুতা কুড়াইয়া পায়ে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এইজন্য দেখিয়া (গরিবুল্লাহ্‌কে এমামতি করতে দেখে) তিনি একহাতে জুতা লইয়াই ছুটিয়া আসিলেন এবং

এক ধাক্কায় গরিবুল্লাহ সাহেবকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আল্লাহ্, আকবর বলিয়া নিজেই এমামতিতে দাঁড়াইলেন।"[১৩০]

কারো কারো মতে 'নায়েবেনবী' গল্পটি খেলাফত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা।[১৩১] গল্পটির একটি অধ্যায়ে খেলাফত আন্দোলনে রত কয়েকজন ছাত্রের চাঁদা সংগ্রহ প্রচেষ্টা এবং তুর্কীটুপী পোড়ানোর প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু একটু মনোযোগে পড়লে বোঝা যাবে, গল্পটি খেলাফত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা নয়। ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ধর্মীয় কলহকে ব্যঙ্গ করা এবং মোল্লা-মৌলবীদের চরিত্র উদ্ঘাটনই লেখকের মূল লক্ষ্য ছিল। বরং বলা যায় খেলাফত আন্দোলন প্রসংগটি এ'গল্পে না থাকলেই ভাল হত। প্রসংগটি নিয়ে অন্য গল্প লেখা যেত।

ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ধর্মীয়-কলহ পর্যায়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দলিল 'মোজাহেদীন'। এ গল্পে হানাফী-মোহাম্মদী বিরোধের নিপুণ চিত্র অংকিত হয়েছে। স্বয়ং আবুল মনসুর আহমদ আত্মকথায় লিখেছেন—"আমার 'আয়না' পুস্তকের 'মোজাহেদীন' গল্পটা নেহাত কাল্পনিক গল্প নয়। ঐ ধরনের বহুসভায় আমি নিজে গিয়াছি। চাচাজী এই ধরনের বাহাসের নামে নাচিয়া উঠিতেন।.....আমার মোজাহেদীন গল্পে উভয়পক্ষের যেসব তথাকথিত যুক্তির অবতারণা, ওসবই ঐ সময়কার বাহাসে দুই পক্ষের দেওয়া যুক্তি।"[১৩২] বাহাসের সভা, সভাশেষে মারামারি, পরিণামে মামলা-মোকদ্দমাতে জেল-জরিমানা সবই এ গল্পে আছে। এবং সে সাথে আছে এ'সব কোন্দল লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মোল্লাদের চক্রান্তের উন্মোচন। মোহাম্মদী-হানাফীদের তফাৎ অতি সামান্য। হানাফী ও মোহাম্মদীদের মধ্যে যেসব প্রভেদ আছে তাদের মধ্যে মোহাম্মদীদের বুকের উপর তহ্রিমা বাঁধা ও হানাফীদের নাভীর নীচে তহ্রিমা বাঁধা উল্লেখযোগ্য। এ নিয়ে কোন বিরোধ হবারই কথা নয় এবং বিবদমান অঞ্চলে আগে কোন বিরোধ আসলেই ছিল না। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে-শাদি, সমাজ-নামায মিলে মিশে চলত। কিন্তু বিরোধ বাঁধাল হানাফী ও মোহাম্মদী এলাকার দুই মাওলানা। হানাফী-মাওলানা একদিন ঘোষণা করলেন মোহাম্মদীরা দোযখী এবং তাদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত। মোহাম্মদী মাওলানা প্রতিবাদ জানালেন। অবশেষে বাহাসের দিন তারিখ ধার্য হল। যথাসময়ে বাহাস শুরু হল। "শুধু হাতে আর কতক্ষণ বাহাস চলে? কাজেই দুই পক্ষই সামিয়ানার খুঁটি ভাঙ্গিয়া বাহাস চালাইতে লাগিল।"[১৩৩] তারপর, জেল-জরিমানা। বাহাসে জিতল কে? "ওদিকে উভয় সম্প্রদায়ের মাওলানারা বাহাস-সভায় বিবরণে দুইটি পৃথক পুস্তিকা বাহির করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন। দেখা

গেল, উভয় পক্ষের পুস্তিকাতেই দাবী করা হইয়াছে যে, বাহাসে তাহাদেরই জয় হইয়াছে।"[১৩৪] জয় কোন পক্ষেরই হয়নি। হয়েছিল আসলে উভয় পক্ষেরই পরাজয়। এ'পরাজয়ের মূলে ছিল বিশেষ করে হানাফী মাওলানার চক্রান্ত। এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি আধুনিক স্কুল। স্কুল চললে—অনাদিকাল ধরে চলে আসা একটি মাদ্রাসার এবং পরোক্ষ নিজের ক্ষতির কথা ভেবে হানাফী-মাওলানা বাঁধিয়েছিল হানাফী-মোহাম্মদী সংঘর্ষ। রক্ষণশীল মৌলবী এবং তাদের চক্রান্তকে ব্যঙ্গ ক'রে লেখক লিখেছিলেন 'মুজাহেদীন' গল্প। এ'গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্র সাদত। সে বুঝতে পেরেছিল হানাফী মোহাম্মদী সংঘর্ষে স্কুলের ক্ষতি হবে সবচাইতে বেশী। গল্পের শেষ দিকে আছে—"সাদত এক নদীর পারে স্কুল গৃহের ছায়ায় বসিয়া সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। সে একবার কারাগামী মুসলমানদের মিছিলের দিকে, আরেকবার নদীর ওপারে সার্বজনীন পূজারত হিন্দুদের দিকে এবং সর্বশেষ নিজের মাথার উপরকার সদ্য পরিত্যক্ত ইস্কুল-গৃহটির দিকে চোখ ফিরাইল। একবিন্দু অশ্রু অতি ধীরে ধীরে তাহার গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।"[১৩৫] "গল্পটি হাস্যরসের মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে করুণরসে শেষ হয়েছে।"[১৩৬]

মুজাহেদীন গল্পে আরবী শিক্ষাপ্রীতিকেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে। হানাফী মাওলানারা আধুনিক স্কুলের বিরুদ্ধে কিন্তু আরবী শিক্ষার পক্ষে। কারণ! "ইমাম মেহ্দী ও খারে দযযালের নাযিল হইবার আর বিলম্ব নাই। আরবী জানা না থাকিলে ইহাদিগকে চিনিতে পারা যাইবে না। কারণ আরবী ভাষাতেই দযযালের কপালে "কাফের" এবং ইমাম মেহ্দীর কপালে 'মোমিন' লেখা থাকিবে। উহারা কখন আসিয়া পড়েন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। সেজন্য সকলেরই আরবী শিখিয়া সবসময় প্রস্তুত থাকা দরকার।"[১৩৭] চমৎকার ব্যঙ্গ। 'কাফের' 'মমিন' দুটো আরবী শব্দ বুঝবার জন্য আগমন তারিখের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আরবী ভাষা শিখতে হবে অথচ আশুপ্রয়োজনের কথা জেনেও ইংরেজী বা আধুনিক শিক্ষা-গ্রহণ চলবে না। এমনি খোঁড়া যুক্তি ছিল মোল্লা-মৌলবীদের।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দাঙ্গা লাগায় মূলতঃ রাজনীতিকেরা—একই ধর্মের মধ্যে দাঙ্গা-কোন্দল বাঁধায় স্বার্থপর মোল্লা-মৌলবীরা। এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে! ইসলামের শত্রু দমনই ছিল মুজাহিদদের কর্তব্য। মুজাহিদরা তাদের কর্তব্য পালন করছিল নিজেদের মধ্যে, স্বধর্মালম্বীদের মধ্যে হানাহানি বাঁধিয়ে।

রক্ষণশীলতা ও নিয়মপালনে বাড়াবাড়ি

এমনিতেই অনেক গোঁড়া মুসলমানদের ঝোঁক বেশী দেখা যায়, ফরযের চাইতে সুন্নত পালনের দিকে। তদুপরি পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই তদানীন্তন সরকার দেশকে তথাকথিত ইসলামীকরণের জন্য ধর্মের নামে নানাবিধ চক্রান্ত শুরু করেন। পাকিস্তান সরকারের কার্যাবলীও ছিল অনেকটা ফরয রেখে সুন্নত নিয়ে টানাটানির মতো। দেশের মানুষকে তথাকথিত খাঁটি মুসলমান করবার জন্য পর্দাপ্রথার অকারণ গুণগান করা হতে থাকে—আরবীভাষাকে আল্লাহ্‌র ভাষার ছুতায় শিক্ষাক্ষেত্রে চালাবার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। নিদেনপক্ষে উর্দু পড়াবার প্রচেষ্টা নেয়া হয়—অন্য কোন কারণে নয়—একমাত্র কারণ উর্দুভাষা আরবী হরফে লিখিত। সে 'সাথে ইসলামী শিক্ষারও মাহাত্ম্যকীর্তন হতে থাকে। আবুল মনসুর আহমদ তাঁর আসমানী পর্দা, শিক্ষাসংস্কার ও আহলে সুন্নত রচনায় ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, ইসলামীকরণের চক্রান্ত ও সুন্নত পালনে বাড়াবাড়িকে ব্যঙ্গ করেছেন।

নাট্যচিত্র 'আসমানী পর্দার' শুরুতে মোনাজাত হল "..... ইসলামের আসল কথাটাই পর্দা।...যে রাজ্যে পর্দা নাই, সে রাজ্যে আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না।"[১৩৮] সুতরাং কথায় কথায় অর্ডিন্যান্স জারির বদনাম থাকিলেও অর্ডিন্যান্স জারি করে মহিলাদের জন্য পর্দা কম্পালসারি করা হল। নাট্যচিত্রের দ্বিতীয় দৃশ্যে জানা গেল মহিলারা স্ট্রাইক করেছে। কারণ? "বেগানা আওরতের মুখ দেখলে পুরুষরার মনে যেমন শাহওয়াত গালেব হয়, "বেগানা মরদের মুখ দেখলে তেমনি আওরতরার ও শাহওয়াত গালেব হয়।"[১৩৯] পুরুষদের মুখ দেখে মেয়েরা গোনাহ্‌গার হতে রাযী হল না। মেয়েরা প্রস্তাব করল পুরুষদেরও বোরখা পরতে হবে। সবাই বোরখা পরলে নারী-পুরুষের ভেদ বোঝা যাবে কি করে? অথবা পরিচিতিই বা জানা যাবে কি ক'রে? তাহলে উপায়? "আমরা টেলিফোনে কথা বলি কেমন কৈরা! তেমনি কথা বলবার গোড়ায় আমি অমুক স্পিকিং বললেই সমস্ত গোলমাল চুইকা যাব।"[১৪০] বোরকার রঙ? প্রথমে মেয়েদের কালো রঙ দিতে চাইলেও বাকবিতণ্ডার পর সব মেয়েদের লালরঙের বোরখা এবং পুরুষদের সবুজ রঙের বোরখা দেওয়া হল। কিন্তু প্রতিনিয়ত নতুন এবং জটিল সমস্যার উদ্ভব হতে থাকল। দেশ উচ্ছন্নে যাবার যোগাড়। আসামী সনাক্ত করার সমস্যা দেখা দিল—চুরি-ডাকাতি বেড়ে গেল। পরীক্ষায় এক জনের খাতায় আরেকজন লিখে দিতে লাগল। প্রিন্সিপাল অব উইমেন্স কলেজ জানালেন লাল বোরখা পরা অনেক যুবক আমার কলেজে ঢুইকা পড়তেছে। মেয়েরার পাশে বৈসা তারা প্রেমালাপ করিতেছে।"[১৪১] বড় ধরনের মুসকিল হল এই যে

"বোরখা পরার সুযোগে অনেকে যে দাড়ি কামাইয়া ফেলতেছে।"[১৪২] ধর্মের জন্য পর্দার আয়োজন। পর্দার সুযোগে দাড়ি কামিয়ে ফেললে ধর্মের আর থাকল কি! সুতরাং পুনর্বার প্রস্তাব উঠল- পর্দা থাকবে না—তবে পুরুষ ও নারীর জন্য আলাদা 'মরদানিস্তান' ও 'যানানিস্তান' হোক। প্রস্তাব মুলতুবী রাখা হল। কিন্তু দেশে বিশৃংখলা বৃদ্ধি পেল। দেখা গেল, যানানিস্তানের পক্ষে মেয়েরা দারুন উৎসাহী। কিন্তু "মরদ ও আওরতের আলাদা দেশ হইলে বিবাহিত মিয়া-বিবিরার মিলনের কি উপায় হইব।"[১৪৩] নতুন প্রস্তাবে বলা হল—দু'দেশের মাঝে কিছু স্থানকে নিউট্রাল যোন বা 'নোম্যান্‌স ল্যান্ড' করে রাখলে সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হ'তে পারে। আবার পর্দার প্রশ্ন সঙ্গত কারণে। এবার মেয়েদের দাবী যানানিস্তান মেনে না নিলে বর্তমান বোরখা ব্যবস্থাই চালু থাকবে। এবার পুরুষের আসল চরিত্র প্রকাশ পেল। প্রধান মাওলানা বললেন: "আমরা মরদরা আর বোরখার ভিতর থাকতে পারব না। আপনেরা মাকুন্দারা পারলেও আমরা দাড়িওয়ালারা কিছুতেই আর একদিনও পারব না। খামাচিতে চুলকাইয়া গাল-মুখ আমরার মহিষের চামড়া হইয়া গেছে (দুইহাতে দাড়ির নীচে চুলকান")[১৪৫] চমৎকার কৌতুক ও ব্যঙ্গ। নিজের ঘাড়ে যখন পড়ল তখন নিজের আইন নিজে ভাঙার জন্য কী খোঁড়া যুক্তি! শেষ পর্যন্ত আসমানী পর্দার ব্যবস্থা হল। স্বয়ং মাওলানার স্ত্রী বললেন: "মানুষের আসল পর্দা শরীরে নয়, আসল পর্দা মানুষের চোখে ও দিলে। ওটাই আল্লাহর দেওয়া আসমানী পর্দা।"[১৪৫] যন্ত্রণায় অস্থিরমাওলানা নিজেই বোরখা ছিঁড়ে ফেললেন এবং সমস্ত বোরখা পুড়িয়ে ফেলবার নির্দেশ দিলেন।

গল্প সংক্ষেপ এবং উদ্ধৃতি থেকেই পর্দা প্রথার প্রতি ব্যঙ্গের তীব্রতা সহজে বোঝা যায়। গল্পের শেষদিকে তথাকথিত আইন প্রণয়নকারীদের স্ববিরোধকেও ব্যঙ্গ করা হলো। আইন প্রণয়নকারীরা নিজেরাই আইন পাল্টাতে ইচ্ছুক—প্রণীত আইনে অসুবিধে হচ্ছে বলে। আইন পরিষদের তোয়াক্কা না করে ঘনঘন অর্ডিন্যান্স জারীকে আসমানী পর্দায় ব্যঙ্গ করা হয়েছে। "অর্ডিন্যান্স না কৈরা যথারীতি আইন করার জন্য পরিষদের বৈঠক দিলে হয় না?...না না, তাতে অনেক হাঙ্গামা। আইন পরিষদ ডাকার খরচও অনেক। তাছাড়া, কেনাকে কিনা কি আপত্তি তুইলা বসে তার নিশ্চয়তা কি!"[১৪৬]

আসমানী পর্দায় উল্লেখযোগ্য দিক এর কৌতুক উপাদান। বিদ্রোহী সংঘের মত এ রচনায়ও কৌতুক উপাদানের ছড়াছড়ি এবং শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গের লক্ষণ অনুসারে অধিকাংশক্ষেত্র কৌতুক ও ব্যঙ্গ একীভূত হয়েছে, পুরুষেরা পর্দা

পরে হাঁটছে; মেয়ে-পুরুষদের জন্য লাল সবুজ বোরখার আয়োজন; বোরখার ভেতর থেকে 'অমুক স্পিকিং' বলে কথা বলা; মেয়েদের বোরখা পরে মেয়েদের কলেজে গিয়ে পুরুষদের প্রেম করা; দাড়িওয়ালাদের বোরখার অস্বস্তি; মাওলানার দাড়ি চুলকানো—ইত্যাকার দৃশ্যগুলো চোখ বন্ধ করে ভাবলেই হাসি রাখা দায় হয়ে পড়ে। অথবা রচনার শুরুতে উষিরে তালিম যখন বলেন—আমরা আলেম সমাজরে কখনও ভুলি নাই। আমরা বহু আলেমরে-ম্যারিজ রেজিস্ট্রার কৈরা দিছি, আরও আলিমরে প্রভাইড করবার জন্য এক কাযীর অফিস ভাইংগা দশটি অফিস করছি—তখন খোঁচাটা সহজেই বোঝা যায়। শিক্ষা মন্ত্রীর কী মহান কৃতিত্ব—ধর্মগুরু আলেমদের করা হলো ম্যারিজ রেজিস্ট্রার এবং এক কাজীর অফিস ভেঙ্গে দশটা কাজীর অফিস। বোরখার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধের কারণ যখন শোনা যায় তখনও হাসি সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। "মেয়েদের গহনা-পত্র ও প্রসাধনদ্রব্য মোটেই বিক্রি হইতেছে না। .... বোরখাতে যদি মুখ ঢাকাই থাকল, অন্য লোকে দেইখা যদি বাহবাই না দিল, তবে পয়সা খরচ কইরা চুল আঁচড়াইতে, সিঁথি করতে মুখে স্নো পাউডার মাখতে যাব কোন গাধা?[১৪৭] এমনকি, এমনি যে রসুলের সুন্নত টুপি-পাগড়ি পরা, লোকে তাও ছাইড়া দিছে। লোকেরা বলতেছে, বোরখার নীচে টুপি পরলাম কি না পরলাম, তা দেখতেছে কে?

ধর্মের এক নগণ্য বিধান পালন করতে গিয়ে ধর্মের অনেক বিধান যায় যায়!

ধর্মীয় নিয়মপালনে বাড়াবাড়ি নিয়ে আরেকটি রচনা শিক্ষা-সংস্কার। এ' রচনায় শিক্ষাপদ্ধতিকে অতিরিক্ত ইসলামীকরণের প্রবণতা ও শিক্ষা-সংস্কারের নামে যারা শিক্ষা-সংহার করছিল তাদের ব্যংগ করা হয়েছে। আসমানী পর্দার মতো শিক্ষা-সংস্কারও একটি নাটাচিত্র। এতে চারটি দৃশ্যও রয়েছে। চরিত্রগুলোর মধ্যে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেকটর, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের প্রেসিডেন্ট, প্রাইমারী শিক্ষার ডাইরেকটর, ডিভিশনাল ইন্সপেকটর অব স্কুল, সরকারী কলেজ সমূহের প্রিন্সিপালগণ, জমিয়তে ওলামার প্রতিনিধি, আলিম, ফাযিল ও ফকিহগণ, শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ও পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী, বাছাবাছা শিক্ষাবিদ ও কয়েকজন এম. এল. এ উল্লেখযোগ্য।

শুরুতে শিক্ষামন্ত্রী জানালেন "...এই আযাদীর কোনও অর্থ থাকবে না, এই পাকিস্তান হাসিল ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি আমরা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিকে ইসলামী করতে না পারি।"[১৪৮] প্রাথমিক প্রস্তাবে কয়েক জনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্জন করে শিক্ষার কয়েকটি মূলনীতি

গৃহীত হলো। প্রথম মূলনীতি হল, শিক্ষার্থীদের শুধু ধর্ম-বিষয়ক ইলিম শিক্ষা দেওয়া হবে। দ্বিতীয় মূলনীতি—যেসব ইলিমে খোদার খোদায়ীর উপর হস্তক্ষেপ করা হয়, যথা ডাক্তারি, কবিরাজি, বোটানি, বায়োলজি প্রভৃতি পড়ান হবে না। তৃতীয় মূলনীতি—যে সব বিদ্যায় মানুষের মধ্যে পৌত্তলিকতা উন্মেষের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে যথা চিত্র-বিদ্যা, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফি প্রভৃতি পাকিস্তানে শিক্ষা দেওয়া হবে না। তারপর এল ভাষার প্রশ্ন। আরবী, উর্দু অথবা বাঙলার কোনটি শিক্ষার মাধ্যম হবে তা নিয়ে প্রচণ্ড বাকবিতর্ক হল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল ইশারায় কাজ চালানো হবে। কিন্তু দস্তখত কিভাবে করা হবে? বুড়োআঙ্গুল বেঁচে থাকতে সে চিন্তা গেল। তাছাড়া "দস্তখতের চেয়ে টিপসই যে অধিকতর মূল্যবান, তার প্রমাণ এই যে, দলিল রেজিষ্ট্রির বেলায় দস্তখত জানা লোকেরও টিপসই দিতে হয়।"[১৪৯] পড়া ইশারায় চলল—লেখা বিদায় নিল। কিন্তু নতুন সমস্যা দেখা দিল যখন জানা গেল, যারা আইন বানিয়েছেন তারা নিজেরাই ছেলেমেয়েদের করাচী পাঠিয়ে খ্রীষ্টানী শিক্ষা দিচ্ছেন। কারণ? "...খৃষ্টান ইংরেজদের হঠাৎ ফেলে যাওয়া এই খ্রীষ্টানী শাসনযন্ত্রকে আমরা রাতারাতি ইসলামী শাসনযন্ত্রে পরিণত করতে পারিতাম। দেশের ছেলেমেয়েরা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শাসনযন্ত্রের ভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত শাসনযন্ত্র চালায়ে যেতে হবে না?"[১৫০] তাই গোনাহর ঝুঁকি নিয়েও তারা ছেলেমেয়েদের ইংরেজী শিক্ষা দিচ্ছেন। তাদের এ ত্যাগের জন্য সভায় তাদের ধন্যবাদ দেওয়া হল। "সভাশেষে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে ডিনার হইল এবং ডিনারের পরে সমস্ত মেম্বরকে গুলিস্তান পিকচার হাউসে 'নাগিনা' বায়োস্কোপ দেখান হইল।"[১৫১]

নাট্যচিত্রের একজায়গায় ভাইস-চ্যান্সেলর বলেছেন "এ কমিটির নাম শিক্ষা-সংস্কার কমিটি না হয়ে শিক্ষা-সংহার কমিটি দেওয়া উচিত ছিল।"[১৫২] ইসলামী-করণের নামে যে কমিটি তাবৎ বিজ্ঞানকে বর্জন করে সে কমিটিকে শিক্ষা-সংহার কমিটি ছাড়া কিইবা বলা যায়। শিক্ষাসংস্কার করতে করতে কমিটি প্রথমে চৌদ্দশ' সাল আগের শিক্ষা অবস্থায় ফিরে গেলেন—তারপর গেলেন ইশারা ও নিরক্ষরতার যুগে অর্থাৎ সম্পূর্ণ আদিম যুগে। এতসব করতে গিয়ে তাদের যে অজ্ঞতা, স্ববিরোধ ও স্বার্থপরতা প্রকাশ পেয়েছে সেগুলোকে আঘাত করেছেন লেখক। প্রথমে ধরা যাক বক্রাক্ষর প্রীতি। আধুনিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ান যাবে না—তবে হাকিমীবিদ্যা শেখানো যাবে। কারণ হাকিমী শাস্ত্রের কিতাবগুলো আরবী ফারসীতে লেখা। প্রসঙ্গত, এ'রচনার কিছু অংশে ৫২'র ভাষা আন্দোলনের পটভূমি এসেছে, তবে বাঙলা ভাষার পক্ষে শক্ত যুক্তি প্রদর্শিত হলেও সুন্দর ব্যঙ্গ জমে ওঠেনি। বরং নেতাদের স্ববিরোধ ও স্বার্থপরতা প্রসঙ্গে কিছু ব্যঙ্গের উদাহরণ মেলে।

ফটোগ্রাফী অনৈসলামিক কিন্তু মন্ত্রী নেতাদের ফটো তুলবার জন্য বিদেশ হতে অমুসলমান ফটোগ্রাফার আনা হবে। নেতাদের ফটো তুলবার বিশেষ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মুসলমান ভাইদের কিছুতেই ফটোগ্রাফির মত গোনাহর কাজ করতে দেওয়া হবে না।[১৫৩] আধুনিক শিক্ষা বন্ধ করে নিজের সন্তানদের ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার পেছনে তাদের স্ববিরোধী বক্তব্য আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। এ'সব ইসলামওয়ালাদের মুখোশও উন্মোচিত হয়েছে রচনার শেষে যখন তারা গুলিস্তান পিকচার হাউসে ধর্মমতে নিষিদ্ধ সিনেমা 'নাগিনা' দেখতে গেল। ধর্মপ্রাণতার কথা তখন তাদের নিশ্চয়ই খেয়াল ছিল না।

'You can not be a satirist Just by telling the truth'. শিক্ষা-সংস্কার এ সত্য আছে, ব্যঙ্গের উপাদানও আছে; সত্যিকারের ব্যঙ্গ নাই। অর্থাৎ পুরো রচনাটি মিলে কোন ব্যঙ্গ সৃষ্ট হয়নি অনাবশ্যক লম্বা করবার ঝোঁক আবুল মনসুর আহমদের অনেক রচনায় দেখা যায়। শিক্ষা-সংস্কার-এ সে প্রবণতা অধিক লক্ষণীয়। তাছাড়া, নাটকাকারে লিখিত হলেও এ রচনায় কোন নাটক নেই—নাটকের কিছু উপাদান বা চিত্র আছে মাত্র।

সুন্নতের বাড়াবাড়িকে ব্যঙ্গ করে লেখা চমৎকার গল্প 'আহলে সুন্নত'। শৈশব থেকে মোল্লামৌলবীর ওয়ায শুনে শুনে হালিম বুঝতে পেরেছিল বেহেশত এবং হুরপরী লাভ করবার একমাত্র উপায় হযরত পয়গম্বর সাহেবের সুন্নত পালন করা। সুন্নতের একটি চার্ট তৈরী করে শোবার ঘরে টাঙিয়ে সেসব সুন্নত পালনে সে তৎপর হল। দাঁড়ি ও বাবরী লম্বা করল এবং গোঁফ নির্মূল করল। প্রথমে একটা বড় মুশকিলে পড়ল—টুপী না পাগড়ী পরবে, তহবন্দ না পায়জামা। একটি সুন্নতও নষ্ট করতে রাযী ছিল না ব'লে টুপীর ওপর পাগড়ী এবং পায়জামার ওপর তহবন্দ পরতে শুরু করল। ওয়াক্তিয়া নামাজ ছাড়াও এশরাক, চাশত, সালাতুত তসবিহ্, এসতেখারা, তাহাযুদ ও আরো অনেক রকমের নামায পড়তে লাগল। "এস্তেঞ্জা করিবার পর কুলখ কার্য উপলক্ষে সে.....দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ধরিয়া পুকুরের পাড়ে পায়চারী করিত..."[১৫৪] কুলুখের জন্য সে স্কুল ছেড়েছিল কেননা, যোহর নামাযের সময় কুলুখ করতে গিয়ে তাকে সহপাঠিদের নিকট নির্যাতন সহ্য করতে হত। হালিমের বাবা অন্যত্র স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি ছুটিতে এসে ছেলের সুন্নতপ্রিয়তা দেখে এবং ছেলের মায়ের পোশাক-পরিচ্ছেদে এমন কি রান্নাবান্নার কাজে সুন্নত প্রচার-এর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। পিতার এক প্রশ্নের উত্তরে হালিম জানাল, স্কুলে যেতে হলে অনেক সুন্নত তরক করতে হয়। পিতা এক পর্যায়ে তাকে জানালেন, সুন্নতের নামে বাড়াবাড়ি করলেই সুন্নত পালন হয় না। তবু কিছুতে কিছু হলনা। হালিমের পিতা তার বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রথমে আপত্তি থাকলেও যখন স্মরণ করিয়ে দেয়া হল, বিয়ে করা সুন্নতে

রাসুলুল্লাহ, তখন সুন্নতের অতবড় পা-বন্দ হালিম আর কোন মতেই আপত্তি করতে পারল না। কিন্তু শাহ্‌নযরের সময় "সে একি দেখিল? এযে পঞ্চাশ বছরের বুড়ী। বেহেশতের হুরীর সঙ্গে যে ইহার কোনও মিল নাই।"[১৫৫] সে রাগে দুঃখে কাঁদতে শুরু করলে তার পিতা তাকে হযরতের সাথে খাদিজার বিয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সুতরাং হযরতের সুন্নত পালনে তার দ্বিধা থাকা উচিত নয়। এবার হালিম চীৎকার করে জানাল "সব সুন্নত কি মানুষে পালন করতে পারে।"[১৫৬] এ কথা সব সময় মনে রাখবার পরামর্শ দিয়ে পিতা জানালেন—বুড়ীটি হালিমের নানী শ্বাশুড়ী। বউ অন্য ঘরে। তারপর? "ইহার কয়দিন পরে দাড়ি মুড়ানো, শেরওয়ানী ও তুর্কী টুপি পরা হালিমকে স্কুলে যাইতে দেখা গেল।"[১৫৭]

আহলে সুন্নত গল্পের বড় সম্পদ কৌতুক উপাদান। শোবার ঘরে সুন্নতের চার্ট টাঙানো, ঝিনুকের বোতাম অসিদ্ধ বলে কাপড়ের পুটলির বোতাম লাগানো, টুপির ওপরে পাগড়ি ও পায়জামার ওপর তহবন্দ পরা; তিন ঘণ্টা ধরে কুলুখ করা ইত্যাদি ঘটনার মাধ্যমে প্রচুর কৌতুক পরিবেশিত হয়েছে। চমৎকার কৌতুক পরিবেশিত হয়েছে ভিক্ষুকের সালামের প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে। "একবার এক ভিক্ষুক তাহাকে সালাম করিয়াছিল। তদুত্তরে সে ভিক্ষুককে বলিয়াছিল "একটু অপেক্ষা কর বাপ,," বলিয়া সে দৌড়িয়া পুকুরের ঘাটে নামিয়া ওযু করিয়া সেই ভিক্ষুকের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল: "ওয়া আলায়কুম সালাম।"[১৫৮]

সুন্নত পালনে বাড়াবাড়িকে ব্যঙ্গ করার সাথে সাথে সুন্নত পালন করতে গিয়ে যারা ফরয তরক করে তাদেরও ব্যঙ্গ করা হয়েছে আহ্‌লে সুন্নত-এ। হালিম ফরয বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করেছিল স্কুলে যেতে হলে অনেক সুন্নত ত্যাগ করতে হয় ব'লে কিন্তু সুন্নতওয়ালার আসল রূপ প্রকাশ পেল যখন বুড়ী স্ত্রীকে মেনে নিতে পারল না। সবশেষে একই সাথে কৌতুক এবং ব্যঙ্গের স্পর্শ পাওয়া গেল যখন নতুন বউ-এর জন্য হালিম দাড়ি মুড়িয়ে সুন্নতী পোশাক বাদ দিয়ে স্কুলের পথে পা বাড়াল।

ধর্ম ব্যবসায়

ধর্মকে অবলম্বন করে ব্যবসায় করবার প্রথা সুপ্রাচীন। বাঙলাদেশেও ঐ ব্যবসায় চলে এসেছে সুদীর্ঘ কাল থেকে। দরগা-আশ্রম, পীর-বাবা আঞ্জুমন সভা ইত্যাদির সাথে বাঙালি মাত্রই পরিচিত। বর্তমান যুগে ধর্ম ব্যবসায় কিছুটা কমে এলেও আবুল মনসুর আহমদের প্রথম যৌবনে পীর-প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। নামায না পড়লেও পীর মানতে হবে—এ ধরনের

মতবাদ তখনকার দিনে চালু ছিল। "একশ্রেণীর মুসলমানদের পীর ভক্তি এই সময় এমন চরম সীমায় উঠিয়াছিল যে, উহা স্পষ্টতঃই ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বিরোধী। এই শ্রেণীর মুসলমানেরা কথা-বার্তা, কাজে কর্মে আল্লাহর পানা না চাহিয়া পীর সাহেবদের পানা চাহিতেন। যেমন তাঁরা.....হুজুর কেবলার মেহেরবানীতে ভালই আছি, 'খাজা-বাবার দোওয়াতে এটা হইয়াছে' ইত্যাদি বলিতেন।[১৫৯] কাজী ইমদাদুল হকের আবদুল্লা উপন্যাসে কাসেম গোলদার তার ছেলের বয়সী আবদুল্লাহকে কদমবুসী করতে অগ্রসর হয়েছিল। কারণ? কারণ, আবদুল্লাহ গোলদারের পীরপুত্র। পীরপূজার সাথে জড়িত অন্য একটি ব্যবসায় কবর পূজা—লালসালুর ব্যবসা। খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী থেকে শুরু করে শাহজালাল, শাহমখদুম, বায়েজীদ বোস্তামীর কবরে কতিপয় ভণ্ডব্যক্তি এ ব্যবসায় এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আঞ্জুমানজাতীয় কোন একটি সেবা প্রতিষ্ঠান খুলে—ফাণ্ড গড়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের চাঁদা নিয়ে শেষ পর্যন্ত পকেটস্থ করবার ব্যবসাও সুপ্রাচীন। এখনও এতিমখানার নামে কোরবানীর চামড়া সংগৃহীত হয়—নির্মাণাধীন পাকা মসজিদের জন্য সংগৃহীত হয় দান-খয়রাত। বলা বাহুল্য, এসব দান খয়রাতের সিংহভাগ সংগ্রাহকদের পকেট ভারী করে। আবুল মনসুর তাঁর 'হুজুর কেবলা,' খাজাবাবা ও লীডরে কওম' গল্পে পীরপ্রথা, কবর পূজা ও আঞ্জুমন ব্যবসাকে তীব্রভাবে আঘাত করেছেন এবং প্রথম দুটি গল্পে দুটি প্রতিবাদী চরিত্র নির্মাণ ক'রে পথ-নির্দেশ দানের চেষ্টা করেছেন।

হুজুরে কেবলার কাছে এসেছেন তাঁর পুরোনো মুরীদ সুফী সাহেব। সঙ্গে একদা ধর্মে অবিশ্বাসী বর্তমানে খেলাফতে যোগদানকারী ধর্মপ্রাণ এমদাদ। এমদাদকে সুফী সাহেব বলেছিলেন পীর না ধরে রুহনিয়ৎ হাসেল সম্ভব নয়। পরিচয়ের আগেই পীর সাহেব সুফী সাহেবকে জানালেন, তিনি বুঝতে পেরেছেন সুফী সাহেব এমদাদের রুহের সুপারিশের জন্য এখানে এসেছেন এবং এক মিনিট চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ থেকে জানালেন—"সে এই ঘরেই আছে"। এমদাদ ভক্তি ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হল। হুজুর কেবলা প্রথমে আরবী, পরে উর্দু এবং শেষে বাঙলায় কথা বলেন। হঠাৎ তিনি চীৎকার করে উঠলেন 'কুদরতে ইযদানী, কুদরতে ইযদানী'। প্রশ্ন করলেন আমরা কত বৎসর হইল এখানে বসিয়া আছি? নিজেই বিবৃত করলেন "সাদুল্লাহ (সুফী) এখানে আসিবার পর আমি আমার রুহকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। সে তামাম দুনিয়া ঘুরিয়া সাত হাজার বৎসর কাটাইয়া তারপর আমার জেসমে পুনরায় প্রবেশ করিয়াছে।"[১৬০]

দূরবর্তী স্থানের মুরীদগণের দাওয়াতে প্রকাণ্ড বজরায় একমণ ঘি, আড়াই মণ তেল, দশ মণ সরু চাউল, তিনশত মুরগী, সাত সের অম্বুরী তামাক এবং

তের জন সাগরেদ লইয়া পীর সাহেব মুরিদানে রওয়ানা হইলেন ..... পীর সাহেবের ভ্রমণবৃত্তান্ত ইংরাজিতে লিখিয়া কলিকাতায় সংবাদপত্রে পাঠাইবার জন্য এমদাদকেও সঙ্গে করিয়া লওয়া হইল"।[১৬১] সন্ধ্যায় পুরুষদের জন্য মজলিশ এবং রাত্রে পুরুষ বর্জিত মেয়েদের মজলিস বসত। মেয়ে মজলিশে ওয়াজ করবার সময় হুজুর কেবলা বাড়ীওয়ালার ছেলে রজবের সুন্দরী স্ত্রী কলিমনের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করতেন। সন্দেহের কোন কারণ আছে কি ? বোধ হয় না। কেননা, হুজুর কেবলা বলতেন, "তাসাউফের বাতেনী কথা বুঝিবার ক্ষমতা এই মেয়েটার মধ্যেই কিছু আছে।"[১৬২] ওয়াজ করবার সময় পীর সাহেবের প্রায়ই জযবা আসত। তাই জযবার সময় একখণ্ড কাল মখমল দিয়ে পরে সাহেবের চোখ-মুখ ঢেকে দিয়ে তার হাত-পা টিপে দেয়ার ওসিয়ত ছিল। এরূপ জযবা পীর সাহেবের প্রায়ই হত এবং মেয়েদের সামনে ওয়ায করবার সময় একটু বেশী হত।

এরপর 'কেরামতে-নেসবতে-বায়নান্নাস' দেখাবার পালা। দেখা যাক কি কুদরত তিনি দেখান। সিদ্ধান্ত হল, হুজুর কেবলা তার প্রধান খলীফা সুফী সাহেবের দেহে শেষ পয়গম্বরের রূহ আনবেন এবং তাঁর সাথে কথা বলবেন। সুফী-সাহেব মূর্ছিতের ন্যায় বিছানায় লুটিয়ে পড়লে হুজুর কেবলা জানালেন হযরতের রূহ তশরীফ এনেছেন। তারপর সওয়ালের পালা। হুজুর কেবলার সাথে প্রধান খলিফার বিভিন্ন সময়ের কানাকানিতে এমদাদ কিছুটা সন্দেহ পরায়ণ হয়েছিল। সে প্রশ্ন করতে চাইল কিন্তু তাকে প্রশ্ন করতে দেয়া হল না। প্রশ্ন করলেন, মাওলানা বেলায়েতনুরী-"আমাদের পীর দস্তগীর কেবলা সাহেব নূরে ইযদানীর জলওয়া সহ্য করিতে পারেন না, তার আমলে কি কোনও গলৎ আছে ?[১৬৩] হযরতের রূহ পীর সাহেবকে জানালেন—

"তুমি মারেফত খুজেছ। কিন্তু শরীয়ত ত্যাগ করিয়া কি মারফত হয় ? পীর সাহেব হাত কচলাইয়া বলিলেন : হুজুর আমি কবে শরীয়ত অবহেলা করিলাম ? উত্তর হইল : অবহেলা কর নাই, কিন্তু পালনও কর নাই। আমি শরীয়তে চার বিবি হালাল করিয়াছি। কিন্তু তোমার মাত্র তিন বিবি।[১৬৪] কোথায় পাওয়া যাবে সে বিবি ? রূহ জানালেন "রজবকে বল স্ত্রীকে তালাক দিতে। কলিমন তোমার জন্যই হালাল। এ মারফতি নিকায় ইদ্দত পালনের প্রয়োজন হইবে না'।[১৬৫] নিজের এবং মুরীদগণের রূহানী নোক্সানের ভয়ে হুজুর কেবলা অগত্যা বিয়েতে রাযী হলেন এবং কলিমনের ঘন ঘন মূর্ছার মধ্যে অতিশয় ত্রস্ততার সঙ্গে শুভকর্ম সমাধা হয়ে গেল। এমদাদের প্রতিবাদ সমর্থনের অভাবে ব্যর্থ হল।

হুজুর কেবলা কেরামত দেখাবেন বলে দীর্ঘদিন ধোঁকা দিচ্ছিলেন এলাকার

লোকদের। শেষ পর্যন্ত কেরামত তিনি দেখালেন। এমাকার লোককে বোকা বানিয়ে মুরীদের পুত্রবধূকে বিয়ে করার মধ্যে এক ধরনের কেরামতিতো নিশ্চয়ই রয়েছে। হুজুর কেবলা গল্পে ভণ্ডামি ও প্রতারণার মুখোশ উন্মোচন করে পীরদের তথাকথিত কেরামতিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। হুজুর কেবলার নারীলোভ এবং বিয়ের চক্রান্তের মুখোশও এ গল্পে সম্পূর্ণ উন্মোচিত। মেয়ে মজলিশেই তার জবরা আসত বেশী এবং কলিমনের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টি-পাতের ফলে কারো যাতে সন্দেহ আসতে না পারে—সেদিকেও তার সতর্ক দৃষ্টি। প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাই সে বলে—'তাসাউফের বাতেনী কথা বুঝবার ক্ষমতা এই মেয়েটির মধ্যেই আছে।' এ সমস্ত হুজুর কেবলার প্রয়োজন হযরতকে নিয়ে ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না। নিজের বার্ধক্য অথবা মুরীদের পুত্র বধূকে বিয়ে করবার ঘৃণ্য চক্রান্তকে নিয়ে কেউ যেন কিছু বলতে না পারে সে জন্য সে হযরতের তথাকথিত রূহকে দিয়ে সুফীর মাধ্যমে বলিয়ে নেয়—

> "তুমি বৃদ্ধ ? আমি ষাট বৎসর বয়সে নবমবার বিবাহ করিয়াছিলাম।"[১৬৬] অথবা, "ইয়া উম্মতি, আমি আমার পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রীকে নিকাহ করিয়াছিলাম, আর তুমি একজন মুরিদের স্ত্রীকে নিকাহ করিতে পারিবে না ?'[১৬৭]

হুজুর কেবলা গল্পে প্রতিবাদী এমদাদ হুজুরের দাড়ি ধরে টান দিয়েছিলেন; আবুল মনসুর নাড়ী ধরে টান দিয়েছিলেন পীরদের কীর্তিকলাপের—ভণ্ডামির। সাধারণ লোকদের আকর্ষণ করবার জন্য হুজুর কেবলার মিথ্যে আত্মপ্রচারকেও গল্পে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। হুজুর কেবলা রূহকে ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর সাত হাজার বৎসরের ঘটনা নাকি দেখতে পেয়েছিলেন—জানতে পেরেছিলেন এমদাদের মুরীদ হবার আরযু। অথচ তার দাড়ি ধরে এমদাদের টান মারার মুহূর্তটি তিনি মোটেও দেখতে পেলেন না। তাছাড়া, তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানদের কাবুল নির্ভরতা, এস্তেখারা, মাওলানাদের ভাষা ব্যবহার ও অসহযোগ আন্দোলনের বাড়াবাড়িকে হুজুর কেবলায় ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

ক. কাবুলে নির্ভরতা ও এস্তেখারা—'অল্পদিন পূর্বে এস্তেখারা করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন যে, চারি বৎসরের মধ্যে কাবুলের আমির হিন্দুস্থান দখল করিবেন।[১৬৮] এ ধরনের কাবুল প্রীতি ও দুঃস্বপ্ন (স্বপ্ন নয়) তদানীন্তন আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, এক সময় আবুল মনসুর আহমদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজীকে বেঙ্গল প্যাকেটের গুরুত্ব বোঝাতে চাইলে সিরাজী সাহেব বলেছিলেন "তিনি খাবে দেখেছেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে কাবুলের আমীর ভারতবর্ষ দখল করিতেছেন।'[১৬৯]

খ, মাওলানাদের ভাষা ব্যবহার—'আমি গরীব কথায় দুনিয়াবী গৌরবং বুঝাই নাই। মুসলমানদের জন্য দুনিয়ার ধন-দওলত হারাম। এই ধন-দওলত এন্‌সানের রূহানিয়ত হাসেলে বাধা জন্মায়, তার মধ্যে নফসনিয়ত পয়দা করে। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন : (আরবী ও উর্দু) বেশক দুনিয়ার ধন-দওলত শয়তানের ওয়াস-ওয়াসা, ইহা হইতে দূরে পলায়ন কর।[১৭০] অতিরিক্ত আরবী ফার্সী শব্দের ব্যবহার ও প্রথমে আরবী, পরে উর্দু এবং সবশেষে বাংলায় বক্তব্য উপস্থাপনের অপ্রয়োজনীয় রীতিকে লেখক একাধিক গল্পে ব্যঙ্গ করেছেন।

গ. অসহযোগ আন্দোলনে বাড়াবাড়ি—"এমদাদ তার সবগুলি বিলাতি ফিনফিনে ধুতি, সিল্কের জামা পোড়াইয়া ফেলিল; ফ্লেক্সের ব্রাউন রঙ্গের পাম্পশু গুলি বাবুর্চি খানার বটি দিয়া কোপাইয়া ইলশা-কাটা করিল। চশমা ও রিষ্টওয়াচ মাটিতে আচড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিল; ক্ষুর, স্ট্রপ, শেভিংষ্টিক ও ব্রাশ অনেকখানি রাস্তা হাঁটিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়া আসিল, বিলাসিতার মস্তকে কঠোর পদাঘাত করিয়া পাথর বসানো সোনার আংটিটা এক অন্ধ ভিক্ষুককে দান করিয়া এবং টুথক্রীম ও টুথব্রাশ পায়খানার টবের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কয়লা দিয়া দাঁত ঘষিতে লাগিল।"[৭]

অর্থাৎ এমদাদ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিল[১৭১]!—গাম্পশুকে ইল্‌শা কাটা করা—অনেকখানি রাস্তা হেঁটে সেভিং সামগ্রী নদীতে ফেলে দেয়া—টুথক্রীমের বদলে কয়লা দিয়ে দাঁত ঘষার মধ্যে কৌতুক ও ব্যংগ একীভূত হয়েছে।

রাজার বিচারকে যারা খাজার (মঈনউদ্দীন চিশতী) বিচার বলে চালিয়ে দেয় অথবা প্রচুর অপকর্মের পরে যারা পীরপূজা-কবরপূজা করে বাঁচতে চায় তাদের এবং সে সাথে লাল-সালু ব্যবসায়ীদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে 'খাজা-বাবা' গল্পে। দারোগা হামিদ প্রমোশন লাভে ব্যর্থ হয়ে ডি. এস. পি খান সাহেবের পরামর্শে প্রথমে কলকাতার তালতলা মানিকতলার বিভিন্ন দরগায় ও পরে খাজা বাবার দরগায় যায়। প্রসংগতঃ, কিছু গরীব লোক সেলিমপুরের রায়দের গোলা থেকে বলে ক'য়ে (এবং কিছুটা জোর করেও) কিছু ধান নিয়ে গিয়েছিল। আজমীর যাবার আগে হামিদ তদন্ত করে গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে কিছুটা নমনীয়ভাবে চার্জশীট দিয়ে গিয়েছিল। এককালের দরগা প্রথায় অবিশ্বাসী হামিদ আজমীরে বিভিন্ন মানুষের প্রার্থনার শব্দাবলী ও দরগায় বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডে বিরক্ত হয় এবং এক পর্যায়ে "চিশতী সাহেবে'র জন্য দোয়া করতে থাকে। হামিদের ধৃষ্টতা দেখে সবাই তাকে মারতে আসে। খান সাহেব কোন প্রকারে তাকে বাঁচান।

দেশে ফিরে এসে হামিদ জানতে পেল ডাকাতির তদন্তে রাজভক্ত খান সাহেবের প্রমোশন হয়েছে এবং তার পদাবনতি হয়েছে। কারণ সে দারিদ্র্যের অজুহাতে ডাকাতদের অপরাধ হালকা করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পদাবনতি সম্পর্কে খান সাহেবের বিশ্লেষণ অন্যরকম। তার ধারণা, হামিদের পদাবনতি খাজাবাবার প্রতি তার গোস্তোকীর ফল। শুনে হামিদ বলল --"এ খাজাবাবার বিচার নয় স্যার, রাজাবাবার বিচার।[১৭২] খাজাবাবা গল্পে হামিদের প্রায় প্রতিটি সংলাপই ব্যঙ্গোক্তি। ডি. এস. পি সাহেব যখন হামিদকে খাজাবাবার অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা শোনাচ্ছিলেন, তখন সে চমৎকার ব্যঙ্গোক্তি করেছিল—"বিশ্বাস কেন করব না স্যার? তবে ভাবছি, খোদ পয়গম্বর সাহেব মাজেযা দেখাতেন না, মাজেয়াওয়ালাদের যাদুকর বলতেন। আর তাঁর উম্মতের মধ্যে মাজেযার কারবার চলল? এটা শুনতে কেমন লাগে।"[১৭৩] অন্যত্র হামিদ মোনাজাত শেষ করে বলল: চিশতী সাহেবের জন্য দোয়া করছি। খান সাহেব মেজাজ গরম করলেন। বললেন: চিশতী সাহেব নয় গরীব নেওয়াজ বল। হামিদ উত্তেজিত সুরে বলল: আল্লাহ ছাড়া কেউ গরীব নেওয়াজ হতে পারে—একথা আমি মানি না।'[১৭৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে প্রতিবাদী হামিদ চরিত্র অংকনে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া পড়েছে। হামিদ দেখল কেউ বুক চাপড়াচ্ছে; কেউ তসবিহ ঘুরাচ্ছে, সবারই মুখে 'ইয়া গরীব নেওয়ায মেরে মকসুদ পুরা কর।'[১৭৫] অন্যত্র হামিদ বলছে, আল্লাহ্‌র নাম ছেড়ে খাজাবাবার নাম বলতে পারব না স্যার.....হে আল্লাহ খাজা সাহেবের গোনা খাতা মাফ কর।[১৭৬] এর সাথে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে লেখকের আত্মকথার উক্তিটি' "পীর সাহেবের গোনাগাতা মাফ করবার লাগি আল্লাহর দরগায় মুনাজাত করছি।"[১৭৭] মীরপুরে পীরের দরগায় লেখক তাঁর কলেজ জীবনে এ'কথাগুলো বলেছিলেন। সঙ্গীরা উক্তি প্রত্যাহারের জন্য জিদ ধরলে লেখক বলেছিলেন: "এই যে আপনারা আল্লাহর কাছে মকসুদ না চাইয়া পীর সাহেবের নিকট চাইলেন, এই যে পীরসাহেবের মাযারে মাথা কুটিয়া দৈনিক হাযার লোক শেরক করিতেছে এতে লোকেরারগোনাহ হইতেছে। পীর সাহেবেরও হইতেছে।..... তাই আমি পীর সাহেবের মাগফেরাত চাহিয়া মোনাজাত করিয়াছি।[১৭৮]

ধর্ম ব্যবসার অন্যতম আধুনিক রূপ ধর্মীয় কোন্দলভিত্তিক পত্রিকা প্রকাশ এবং আঞ্জুমানে তবলিগুল ইসলাম জাতীয় সভাসমিতি প্রতিষ্ঠা। কৌশলে মযহাবী-বিরোধের পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করে অশিক্ষিত ইসমাইল কি করে ধীরে ধীরে পত্রিকার মালিক হলো, মাওলানা উপাধি ধারণ করল, বিজ্ঞাপন-সর্বস্ব আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করে কিভাবে কওমের নেতৃত্বে আসীন হলো, সেই ভাঁওতার কাহিনী লীডরে কওম। আবুল মনসুর আহমদ তথাকথিত ক্ষণজন্মা

পুরুষ ইসমাইলের মাধ্যমে ধর্ম ব্যবসায় আধুনিক রূপকারদের ব্যঙ্গ করেছেন। হেন কাজ নেই বলা চলে যা এককালের কপর্দকহীন, অশিক্ষিত অখ্যাত ইসমাইল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য করেনি। তার মত—পথের পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। এককালের হানাফী ভাবাপন্ন ইসমাইল আহলে হাদীস মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হওয়ার পর, মোতাওয়াল্লি সওদাগর হাজী সাহেবের হানাফী বিদ্বেষ দেখে শুরুতেই ভোল পাল্টাল। ইসমাইল সাহেব হানাফীদের পরিচালিত মাদ্রাসা ইস্কুলে হানাফী শিক্ষকদের কাছে পড়াশোনা করিয়া অনেকটা হানাফী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেও, এখন হইতে তিনি অকস্মাৎ পাকা মোহাম্মদী বনিয়া গেলেন।"[১৭৯] এ' ধরনের সুবিধাবাদ কি শুধু ইসলাইলের? ইসমাইল কি দেশে মাত্র একজন! বলাবাহুল্য, ভোল পাল্টানোর খেলায় ইসমাইলের এটা শেষ নয়, শুরু-মাত্র? হানাফী নিন্দায় হাজী সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাজী সাহেবের বাড়ীতে আস্তানা গাড়তে সক্ষম হলো এবং মাযহাবী বাহাসের প্রচারের সীমাবদ্ধতার ব্যাখ্যা করে হাজী সাহেবকে দিয়ে 'আহ্‌লে হাদীস গুর্য' নামক কাগজ বের করাতে সক্ষম হলো। সম্পাদক হলেন, ইসমাইল সাহেব। ক্রমে হানাফী নিন্দার সাথে সাথে ইংরেজ নিন্দাও কিছু কিছু হতে লাগল। ইংরেজ নিন্দা কেন? জাতীয়তাবাদী চেতনা? নাকি অন্য কিছু? ইসমাইল সাহেব মুখে বললেন বটে ইংরেজ নিন্দা গ্রাহক বাড়াবার কৌশল মাত্র। আসলে ছিল সেটা পত্রিকার মালিক হবার জন্য একটা নিপুণ চাল। হাজী সাহেব পত্রিকায় ইংরেজ নিন্দার কথা শুনতে পেয়ে বললেন, 'বাবা ইসমাইল, হানাফীদের সাথেই আমাদের লড়াই, ইংরাজদের সঙ্গেত আমাদের কোনও দুশমনি নেই।'[১৮০] হাজী সাহেবের চমৎকার প্রতিক্রিয়া এবং চমৎকার প্রতিক্রিয়া নিয়ে চমৎকার ব্যঙ্গ। বিদেশী বিধর্মী ইংরেজদের চাইতে একই ধর্মাবলম্বী ভিন্ন মাযহাবীরা বড় শত্রু—যাদের সাথে তাদের মূল তফাৎ নামাযকালে নাভীর নিচে অথবা উপরে হাত রাখার মধ্যে। হাজী সাহেবের মত ব্যক্তি দেশের ধর্মক্ষেত্রে এমনকি রাজনীতিক্ষেত্রে আজকের দিনেও বিরল নয় বলা চলে। এখনও দেখা যায় কিছু মধ্যপন্থী জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ, প্রতিক্রিয়াশীলদের চাইতে খাঁটি সমাজতন্ত্রীদের ঘৃণা করেন অনেক বেশী। সে যাই হোক, ইচ্ছাকৃত ইংরেজ নিন্দার সুযোগে ইসমাইল এক সাজানো পুলিশের মাধ্যমে হাজী সাহেবকে ভয় দেখিয়ে অন্যত্র প্রেস সরিয়ে নিজেই তার মালিক হল। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় শীর্ষদেশে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হচ্ছিল, মওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব প্রতিষ্ঠিত।

মালিক হয়ে আবার বোল এবং ভোল পাল্টালেন ইসমাইল সাহেব। নিজে নিজেই বনে গেলেন মুসলিম বংগের অবিসম্বাদিত নেতা। মাযহাবী বিরোধ ত্যাগ করে সমস্ত মুসলমানের কল্যাণের জন্য এহ্‌তেকাফে বসার কথা প্রচার

করলেন। মাযহাবী বিরোধ ত্যাগের মধ্যে উদারতার মুখোশ থাকলেও আসলে ওটা ছিল পত্রিকার গ্রাহক বাড়াবার নতুন কৌশল মাত্র। মুসলমানদের কল্যাণ কথাটা ভাঁওতা মাত্র; নিজের কল্যাণই আসল কথা। তারপর? তারপর তাঁর দীর্ঘ জীবনের জন্য খোদার কাছে দোয়া করতে পাঠক-পাঠিকাকে অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকীয় বের হতে থাকল। বলাবাহুল্য ইসমাইল সাহেবই নিজহাতে এ'সব সম্পাদকীয় লিখিতেন এবং ধ্যান এহতেকাফ্ বা করিবার সশরীরে গুর্ষ কার্যালয়ে অবস্থান করিয়াই সব করিতেন।''[১৮১]

এবার নতুন এবং সেরা খেলা। এহতেকাফের ফল প্রকাশিত হল—বাঙলায় ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বিভিন্ন জেলায় আঞ্জুমনের শাখা স্থাপন করে ত্রিশ টাকা মাইনের প্রচারক নিযুক্ত করতে হবে। এজন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার দরকার এবং তিন কোটি মুসলমানের দেশে এ' টাকা কিছুই নয়—সুলিখিত প্রবন্ধের মাধ্যমে তা জানানো হল। আঞ্জুমন কিভাবে গঠিত হল? সভাপতি, সম্পাদক অথবা কোষাধ্যক্ষ কে? "সদস্যগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও হযরত মাওলানা সাহেব উক্ত আঞ্জুমনের সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের বিরাট দায়িত্ব বহন করিতে রেয়ামন্দি ফরমাইয়াছেন।''[১৮২] এ ধরনের অনিচ্ছা অনেকেরই থাকে এবং এ জাতীয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে দেশের শাসনভার পর্যন্ত নেন।

প্রচুর চাঁদা এলো। ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হল কি? কাজ নয়, শুরু হল নতুন ছুতা। বেআক্কেলপুরের দাঙ্গা এবং দুর্ভাগ্য সুরের বন্যার ছুতায় ইসলাম প্রচারের কাজ বন্ধ রাখলেন ইসমাইল সাহেব। বরং বন্যার জন্য নতুন রিলিফ ফান্ড খুলে আরো টাকা সংগ্রহ করলেন। হঠাৎ এলো খেলাফত আন্দোলনের বন্যা। তিনি খেলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবারে হিন্দু-মুসলিম মহিমা কীর্তন শুরু করলেন এবং জানালেন বর্তমান অবস্থায় তবলিগ কার্যে হাত দিলে হিন্দু-মুসলিম একতায় বিঘ্ন আসবে। হিন্দু-মুসলিম একতার কথা পড়ে এবারে অনেক হিন্দুও পত্রিকার গ্রাহক হল। কংগ্রেস থেকে শুরু করে বিভিন্ন হিন্দু-সভাসমিতিতে সভাপতিত্ব করবার সুযোগ পেলেন মাওলানা ইসমাইল। 'চাকুরী ব্যতীত অন্য সর্বত্র হিন্দুরা মুসলিম প্রতিভার সমাদর করে''[১৮৩]—সুযোগ পেয়ে প্রাসঙ্গিক ব্যঙ্গ করলেন লেখক। হঠাৎ দুর্ভাগ্য এলো মাওলানার জীবনে। আমলাতন্ত্রের রোগে পড়ে দু'বছর কারাবাস করলেন। অবশেষে রাঁচি চলে গেলেন। ভাওতা বন্ধ হয়েছে কি? শেষতম ভাঁওতা দিলেন মাওলানা রাঁচি যেন হেরাপর্বতের গুহা। তিনি মুসলমানের কল্যাণের জন্য রাঁচির শান্ত প্রকৃতির বুকে সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবেন।.....তাঁহার সাধনার ফল গ্রন্থাকারে বাহির হইবে। গুর্ষের গ্রাহক-গ্রাহিকাদিগকে তাহা অর্ধমূল্যে দেওয়া হইবে।''[১৮৪]

"মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানদের আত্মবিকাশের সেই সময়টিতে মাওলানা ইসমাইলরা ছিলেন সক্রিয়। তাদের প্রতিষ্ঠাও এসেছিল যথেষ্ট—সমাজের কাছে তাঁরা পরম ত্যাগনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। কিন্তু এর ভিতরের ফাঁকটুকু প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আবুল মনসুর আমাদের কৌতূহলী দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি"[১৮৫] প্রত্যক্ষদর্শীর কৌতূহলী দৃষ্টিকে সৃষ্টির কাজে লাগিয়ে আবুল মনসুর উপহার দিয়েছিলেন 'লীডরে কওম'। তথাকথিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সুবিধাবাদ, মিথ্যে সাংবাদিকতা, অকৃতজ্ঞতা, মাযহাবী-কোন্দল লাগাবার চক্রান্ত এবং আঞ্জুমানের নামে রিলিফ ফান্ড খুলে নিজের জন্যে টাকা সংগ্রহের ব্যবসাকে এমন ব্যঙ্গের চাবুক হানতে বাঙলা সাহিত্যে খুব বেশী দেখা যায়নি। লেখকের কৌতূহলী দৃষ্টির সাথে তির্যক কৌতুকী দৃষ্টি কিভাবে রসঘন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, তার আরো কিছু নমুনা নেয়া যাক।

> ক. মসজিদের মোতাওয়াল্লী সওদাগর হাজি সাহেবকে যদি খোদা একদিনের জন্যও এদেশের বাদশা বানাইয়া দিতেন, তবে তিনি দেশকে হানাফী শূন্য করিয়া ফেলিতেন। সেদিকে সুবিধা হওয়ার কোন সম্ভাবনা আপাততঃ না থাকায় অগ্যতা বাহাসের সভার আয়োজন করিয়া বেনারস ও অমৃতসর হইতে মাওলানা আমদানি করিবার ব্যাপারে প্রচুর টাকা খরচ করিয়াই তিনি খোদার ঐ ভুলের প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।[১৮৬]
>
> খ. বেকার গ্র্যাজুয়েটরা মৌলবী না হওয়ার জন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল এবং প্রচারকের যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলামের সৌন্দর্যে ওয়াকিফ হাল হইবার জন্য আহমদিয়াদের প্রকাশিত ইংরেজী গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়া গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করিতে লাগিল।[১৮৭]

'লীডরে-কওমে'র শেষাংশে আছে—সশরীরে হযরত মাওলনা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে থাকিবেন না বটে, কিন্তু তাহার আত্মা অলক্ষ্যে থাকিয়া সর্বদাই দেশকর্মীদের প্রাণে বল দান করিবে। তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইলে মুসলিম বঙ্গ তার অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে। সুতরাং কোনও ভয় নাই। মুসলমান সমাজ অগ্রসর হও! নসরুম মিনাল্লাহে ফৎহুন করীব। জনসেবা ইউনিভার্সিটির উপসংহারের সাথে ঐ অংশ মেলানো যেতে পারে—ইয়াকুব সাহেবের আদর্শ জীবন আজো এদেশের সকল তরুণ বৃন্দের প্রাণে জনসেবার অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। তাইনা এদেশে জনসেবকের এমন ভিড়।

আয়রণির এমন সুচারু ব্যবহার মনসুর অনেক গল্পেই করেছেন কিন্তু আয়রণি অব ফেট হল, এ'ধরনের জনসেবক এবং লীডরে কওমদের ভিড় আজো কমল না!

'গালিভারের সফরনামা' ও 'আদু ভাই' প্রসঙ্গ

আবুল মনসুর আহমদের দুটি রচনা আলাদাভাবে আলোচিত হবে। রচনা দুটো হচ্ছে যথাক্রমে 'গালিভরের সফরনামা' ও 'আদু ভাই'।

গালিভরের সফরনামা

গালিভার নয় গালিভর; গালিভারের সফর নামা নয়, গালিভরের সফর নামা। গালিভর আসলে ছিলেন বাঙালি। কিভাবে গালিভর হলেন? দুটো তত্ত্ব। এক, তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় স্পষ্টবাদী। তাঁর স্পষ্ট কথাকে লোকে গালি মনে করত। তাই শত্রুরা তার নাম দিয়েছিল গালি ভরা। সেই থেকে তিনি গালিভর নামে মশহুর। দুই "গালিভর সাহেব নোয়াখালী জিলার বাসেন্দা ছিলেন। তার আসল নাম ছিল গালিব। নোয়াখালী জেলার গালিব পুর গ্রাম আজও তাঁর স্মৃতি বহন করিতেছে। এতে স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যাইতে পারে যে দুশমনেরা গালিব নামকেই বিকৃত করিয়া গালিভরা বা গালিভর করিয়াছিল।[১৮৯] গালিভরের বাঙলা সফর নামা বাউনের দেশে ও দেও-এর দেশে। "...ইংরেজী সফরনামা লিখিয়াছিলেন তিনি ফিযিক্যাল জায়েন্ট (দেও) ফিযিক্যাল ডুয়ার্ফদের লইয়া আর বাংলা সফরনামা লিখিয়াছিলেন তিনি ইন্টেলেকচুয়াল জায়েন্ট (দেও) ও ইন্টেলেকচুয়াল ডুয়ার্ফ (বাউন) দের লইয়া।[১৯০]

প্রথমে গালিভর এসেছিলেন ইন্টেলেকচুয়াল ডুয়ার্ফ অর্থাৎ বামনদের দেশে। এরা মাথায় ছোট এবং বহরে বড়। তবে এরা 'বাঙালী সন্তান' কিনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বলে দেয়া হয়নি। বুদ্ধিতে খাটো এ লোকদের দেশে, বই ও অন্যান্য জিনিসপত্রের বিক্রেতারা দোকানে বসে না থাকলেও ক্রেতারা পুরো দাম দিয়ে জিনিস কেনে। কন্ডাক্টর না থাকলেও যাত্রীরা ট্রামের ভাড়া বুঝিয়ে দেয়। গালিভর অবাক হলেন এবং ক্রেতাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিছু কিছু বাঁচাইলে অনেক সঞ্চয় হইতে পারে।[১৯১] লাভ হল কি?" "দুঃখের বিষয় কিন্তু আমার বাহক ও, সঙ্গীরা আমার কথা বুঝিল না। আমি বুঝিলাম, আল্লাহ বেচারাদের দেহ যতটা বড় করিয়াছেন, মগয অতটা বড় করেন নাই। আহা মানুষ এত নির্বোধও হয়। এরা শরীরের দিকে দেও হইলেও মনের দিকে এরা বাউন মাত্র।"[১৯২] পরে গালিভর আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন, বোকাচন্ডীরা সরকারী গাড়ী ব্যবহার না করে পায়ে হাঁটে; পরাজিত হবার কথা না ভেবে নির্বাচন দিয়ে দেয়; ইচ্ছেমত শাসনতন্ত্র পাল্টায় না; বিনাবিচারে

কাউকে আটক করে না; স্বয়ং প্রেসিডেন্টও গৃহভৃত্য রাখেন না; কর্মচারীদের সাথে উচুনীচু ভেদাভেদ করেন না। বিস্ময়ে এবং বিরক্তিতে এ ধরনের আহম্মকের দেশ থেকে গালিভর পালিয়ে গেলেন।

গালিভর মনের মত দেশ খুঁজে না পেয়ে মনের দুঃখে হজ্ব করতে গেলেন। হঠাৎ দেখলেন "……একদল শিশু এক হাওয়াই জাহাজ হইতে নামিতেছে। এতগুলি দুগ্ধপোষ্য শিশু কোথা হইতে কেন আসিল, জানিবার জন্য কাছে গেলাম। দেখিলাম, আকারে শিশুর মত হইলেও আসলে তারা বয়স্ক লোক। একজন অতিশয় বুড়া। সকলেই তারা খুব দামী পোশাকে সজ্জিত।"[১১৩] আলাপে গালিভর বুঝতে পারলেন তিনি এতদিনে মনের মত মানুষ খুঁজে পেয়েছেন। সকলেই বুদ্ধিমান। এরা সরকারী খরচে নিজেদের হজ্ব করবার যোগ্যতা রাখে; ইলেকশন ঠেকিয়ে চল্লিশ বছর ধরে প্রধান মন্ত্রীত্ব চালাতে পারে; স্বজনের মাধ্যমে অথবা বেনামী ব্যবসা করে; ফরজের চেয়ে নফল নামাজ বেশী পড়ে। এদেশে বিক্রেতারা দুধমেশানো পানি বিক্রি করে—ক্রেতারা অচল ও জাল নোট চালায়। ভোট না দিলে প্রধানমন্ত্রী ৯২ নম্বরের এটমবোমা মেরে দেয়। এদেশে কোন শাসনতন্ত্র আছে কি? 'শুধু আমরাই ইচ্ছামত দেশশাসন করিব, এটাই এদেশের শাসনতন্ত্র। এটাই এ দেশের আইন।'[১১৪]

গালিভর বুঝলেন, বুদ্ধিমানের দেশ বটে। আল্লাহ এদেশবাসীকে দেহে ছোট করেছেন বটে, কিন্তু বুদ্ধিতে বড় করেছেন। তিনি এদেশে স্থায়ী বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং গৃহী হলেন।

বাঙালি গালিভর মনের মত দেশ খুঁজে পেয়েছিলেন। সে দেশ কি বাংলাদেশ? বাংলাদেশে এখনও কি তার বংশধরদেরই প্রাধান্য? সে আলোচনায় পরে আসা যাবে।

আবুল মনসুর আহমদ গালিভরের সফরনামায় গালিভর এবং তার শেষতম আবাস দেও এর দেশের মাধ্যমে বাঙালী জাতি এবং দেও এর দেশের মানুষের সার্বিক নীতিহীনগণকে ব্যঙ্গ করেছেন।

গালিভরের সফরনামা। প্যারডি প্যারডির প্যারডি। রচনাটি সুইফটের গালিভার্স ট্রাভেলস-এর প্যারডি। গালিভার্স ট্রাভেলস ছিল ড্যাম্পিয়ার্স ভয়েজ এর প্যারডি। সাধারণ প্যারডিতে হাস্য-কৌতুক প্রাধান্য লাভ করে। উৎকৃষ্ট প্যারডিতে রসাঘাতের সাথে ব্যঙ্গের কষাঘাত ও থাকে। গালিভরের সফরনামা উৎকৃষ্ট প্যারডি ব্যঙ্গ এবং একই সাথে উৎকৃষ্ট রূপকও। সেসাথে আগাগোড়া আয়রণির ব্যবহার এ'রচনাকে দিয়েছে চমৎকার শৈল্পিক উৎকর্ষ।

সর্বোপরি, এ রচনায় রূপক এবং আয়রণি একীভূত হওয়াতে, রচনাটি লাভ করেছে অনন্যতা।

এবারে রূপক নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমে ধরা যাক, বাউনের দেশের কথা। বাউনের দেশে পরস্বাপহরণকারী নেই, চোর নেই, প্রতারণা নেই, সরকারী সম্পত্তির অপব্যবহার নেই, রাজনৈতিক নেতাদের তালবাহানা নেই, উঁচুনীচু ভেদাভেদ নেই। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে কি? কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি। আসলে এটি লেখকের ইউটোপিয়া মাত্র—কল্পনার আদর্শ নগরী। 'ইউটোপিয়া' নিয়ে কি ভাবে ব্যঙ্গ সম্ভব হল? ব্যঙ্গ, ইউটোপিয়া বা আদর্শ নগরীর মানুষকে নিয়ে করা হয়নি। ব্যঙ্গ সৃষ্ট হয়েছে বাঙালী গালিভরকে নিয়ে চমৎকার আয়রণির মাধ্যমে—যে ওই দেশটি দেখেছিল। আয়রণিতে কোন বর্ণনার বাহ্যিক অর্থ আর লেখকের উদ্দিষ্ট অর্থের মধ্যে ফারাক থাকে। 'ফারাকটি ধরতে পারলেই আয়রণির রসোপলব্ধি সম্ভব। "গরমভাতে বিলাই ব্যাজার"। গালিভর গরম ভাত অর্থাৎ ভাল দেশের ভাল দেখে ব্যাজার হয়েছে। বিস্মিত হয়ে থেমে থাকেনি। বিস্মিত হয়ে নিজ দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সেদেশের মানুষের ভুল ধ'রে প্রশ্ন করেছে। গালিভরের প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে আয়রণি আর তাতেই জমেছে ব্যঙ্গ। গালিভরের একটি প্রশ্ন এ'রকম—আপনারা এদেশের প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী? তবে সরকারী মোটরে চলাফেরা না করিয়া আপনারা পায়ে হাঁটিয়া এবং নিজের গাঁটের পয়সায় ট্রেনে চলাফেরা করেন কেন? এ'দেশে সরকারী মোটর নাই কি?[১১৫] নিজস্ব অভিজ্ঞতার জগত থেকে গালিভরের প্রশ্নের মাধ্যমে লেখক ব্যক্তিগত কাজে সরকারী যানবাহন ব্যবহারকে ব্যঙ্গ করলেন। গালিভরের বর্ণনা ও লেখকের উদ্দিষ্ট অর্থে ভিন্নতার কারণে চমৎকার আয়রণির সৃষ্টি হল। নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশের প্রেসিডেন্টের সাথে গালিভরর কথোপকথন শোনা যাক—

> গালিভর: আপনি ইলেকশন দিতে গেলেন কেন? যদি হারিয়া যান? আর যদি প্রেসিডেন্ট হইতে না পারেন?
>
> প্রেসিডেন্ট: দেশের লোক যদি না চায়, তবে প্রেসিডেন্ট হইব না, তাই বলিয়া কি নির্বাচন দিব না? নির্বাচনের সময় যে আসিয়া পড়িয়াছে।
>
> আমি: (অর্থাৎ গালিভর) সে সময়ত আপনি পিছাইয়াও দিতে পারেন, ... যারা প্রতিবাদ করবে, ... নিরাপত্তা আইন করিবেন, বিনা-বিচারে আটক করিবেন।[১১৬]

অন্যত্র গালিভরের বর্ণনা—

> চাকর মনিবকে নাম ধরিয়া ডাকে। মনিব চাকরকে মিষ্টার

বলে। অর্থাৎ এমন অসভ্য দেশ এটা যে এখানে মুড়ি-মুড়কির একদাম...উচ্চ-নীচ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। এই যারা মানে না তারা ধর্মে বিশ্বাস করে না। অতএব এমন ধর্মহীন, আহমকরার দেশে থাকিয়া কবে কোন বিপদে পড়িব, সেই ভয়ে একরাত্রে আমি কাউকে কিছু না বলিয়া সে দেশ হইতে পলাইয়া আসিলাম।[১১৭]

আগাগোড়া রিটোরিক আয়রণির খেলা। নিজের দেশের অভিজ্ঞতা থেকে গালিভর কথা বলছে, যুক্তি দিচ্ছে। নিজের দেশের মন্দত্ব বুঝতে না পারার মধ্যে রয়েছে লেখকের কৌশল। গালিভর যাদের আহমিক ভাবছে আসলে তারা আহমক নয়—এখানেও রয়েছে আয়রণি। আর এ আয়রণির অস্ত্রের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করা হলো গালিভরের দেশের প্রেসিডেন্টদের নির্বাচন পিছানো ও বিরোধীদের বিনাবিচারে আটকের প্রহসনকে। ব্যঙ্গ করা হলো ধর্মের নামে উঁচুনীচু ভেদাভেদকারীদের। শ্রেণীভেদ না থাকা সভ্যতার লক্ষণ—শ্রেণীভেদ-কলুষিত মন নিয়ে গালিভর এ কথা বুঝতে পারছে না। উল্টো তর্ক করছে ধর্মের দোহাই দিয়ে। গালিভর নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবছে এবং আদর্শ দেশের লোকদের ভাবছে বোকা। তাহলে ব্যঙ্গটা পড়ে গালিভরের ঘাড়ে। লেখক জানিয়েছেন, গালিভর বাঙালী। তাহলে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হল, আসলে বাঙালী জাতির সার্বিক নীতিহীনতার ওপর।

দেওএর দেশের উযিরে আযমের কীর্তিকলাপ ও কর্মকুশলতা রচনা-সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। 'বলতে পার সে দেশ কোথায় সকলদেশের সেরা? কোথায় খুঁজে পাওয়া গেল এ'দেশ? মনে হয়, 'সকল দেশের রানী সেযে আমার জন্মভূমি'! বাঙালী গালিভরের ভ্রমণতীর্থ, রূপকের আড়ালে বর্ণিত দেশটি যে বাঙলাদেশ (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান) সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। উজিরে আযমের সাথে গালিভরের কথোপকথন শুনলে দেশের পরিচয় গোপন থাকে না।

উজিরে আযম.....আমিও ৯২ নম্বরের এটম বোমা মারিয়া সমস্ত আইনসভাকে হিরোশিমা নাগাসাকি করিয়া দিয়াছি।

আমি: আপনারা ৯২ নম্বরে বোমা মারিয়া আইনসভা বাতিল করিয়া দিয়াছেন, তবে আপনারা মন্ত্রী আছেন কি রূপে?

উজিরে আজম: আমরা ক্যাবিনেট অব ট্যালেন্ট কায়েম করিয়াছি। এতে আইন সভার কোন দরকার হয় না"[১১৮]

'৯২ নম্বরের বোমা' এবং 'ক্যাবিনেট অব ট্যালেন্টস' তৎকালীন সরকারের ৯২-ক ধারা ও ক্যাবিনেট অব ট্যালেন্টস-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। ১৯৪৯ সালের মার্চে প্রথম উপনির্বাচনে (যা মুখ্যমন্ত্রীর নিজ জেলাতেই অনুষ্ঠিত) মুসলিম লীগ প্রার্থী একজন তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পরাজিত হন; নুরুল

আমিন সরকার এতে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। ১৯৫১ সালে সাধারণ নির্বাচন হবার কথা থাকলেও আমিন সরকার গণপরিষদের সহায়তায় আইনের মারপ্যাঁচের মাধ্যমে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পুনরায় নির্বাচন মুলতবী রাখলেন। এ সময় সমগ্র রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্রকর্মীদেরকে নিরাপত্তা আইনে জেল-বন্দী করা হয় [১৯৯]

বলা হয়েছে গালিভরের সফরনামায় সার্বিক নীতিহীনতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। আরো কিছু উদাহরণ নেয়া যাক।

ক. অধর্মের মাধ্যমে ধর্মকার্য করা এবং রথ দেখা ও কলা বেচাকে ব্যঙ্গ, যেমন :

> আমি কৌতূহলী হইয়া বলিলাম : সরকারী খরচে নিজেরায় ধর্মকার্য করিতে আসিলেন, এতে আপনেরার দেশবাসী আপত্তি করিবে না ?
>
> রাষ্ট্রপতি : সে আপত্তির পথ করিয়াই আসিয়াছি; একটা সরকারী কাজের অজুহাত বানাইয়া লইয়াছি। এ দেশের সরকারী লোকের সাথে কিছু সরকারী বাৎচিৎ করিলেইত আমরার এ সফর সরকারী হইয়া গেল। আমরার দেশের উম্মী লোকেরাও রথ দেখা ও কলাবেচা এক সঙ্গেই করিয়া থাকে।[২০০]

খ. পারমিট ব্যবসা ও ঘুষ প্রথার প্রতি ব্যঙ্গ—

> 'আত্মীয় স্বজনকে দিয়া অথবা বেনামীতে নিজেরাই অধিকাংশ ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতেছি। অপর লোক–যারারে পারমিট কন্ট্রাক্ট দিয়া থাকি, তারার সবার নিকট হইতেই মোটা রকম পার্সেন্টেজ লইয়া থাকি।[২০১]

গ. সার্বিক প্রতারণাকে ব্যঙ্গ—

> 'দুধ কিনিতে যাও সেরে পাইবে তিন পোয়া পানি।.....আমার দলের নিকট হইতে টাকা নিয়া আমার গাড়ীতে চড়িয়া আরেক দলকে ভোট দিয়া আসে। পানি মিশানো দুধ ও কঙ্কর মিশানো চাউল দেওয়ার বদলা খরিদ্দাররা কিভাবে করে ? ..... অন্ধকারে ফাঁক পাইলেই অচল টাকা ও জাল নোট দিয়া দান পরিশোধ করে।[২০২]

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। মাসতুতো ভাইদের চিনতে পেরে গালিভর 'দেও-এর দেশে গুহী হয়েছিলেন। রূপকের দেশটি যেহেতু বাঙলাদেশ, সেহেতু

কি বলা যায়, বাংলাদেশে এখনো গালিভরের বংশধরদের প্রাধান্য ? ব্রবডিংন্যাগের রাজা গালিভারের দেশ সম্পর্কে আলাপের পর বলেছিলেন ..... you have clearly proved that ignorance idleness, and vice, may be sometimes the only ingredicuts for qualifying a legistator; that laws are best explained, interpreted and applied by those whose interest and abilities lie in preverting, confounding and eluding them. I observe among you some lines of an institution, which in its original might have been tolerable, but these half erased, and the rest wholly blurred and blotted by corruptions. ... I cannot but conclude the bulk of your natives to be the most perniclous race of little odious vermin that nature even suffered to crawl upon the surface of the earth."[২০৩] দেও-এর দেশের মাসত্তো ভাইদের মুখে ঐ বক্তব্য আশা করার প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু বাউনের দেশের প্রেসিডেন্ট, গালিভরের দেশ সম্পর্কে এ রকম মন্তব্য করলে বিস্মিত হবার কিছুই ছিল না।

প্যারডির বিষয়টি প্রসঙ্গত আলোচিত হতে পারে। ড্যাম্মিয়ার্স ভয়েজের প্যারডি করেছিলেন সুইফট, আবুল মনসুর আহমদ করেছিলেন গালিভার্স ট্রাভেলস এর। সুইফটের মূলগ্রন্থের 'The publisher to the Reader' এর মতো গালিভরের সফরনামার মূল রচনায়ও রয়েছে প্রকাশকের আওতায়। গালিভার জাহাজ ভেঙ্গে নতুন দেশে ওঠে; গালিভারও যথারীতি জাহাজ ভাঙ্গার কারণে বাউনের দেশে উঠেছিল। গালিভর ব্রবডিংন্যাগে মানুষের বৃহদাকার দেখেছিল, গালিভরও তদ্রূপ ঃ দেখিলাম, ঘাটে কতগুলি দেও···সমুদ্দুর হইতে বড় বড় তিমি মাছ ধরিয়া সুরুজের তাপে 'ফ্রাই' করিয়া খাইতেছে।[২০৪] গালিভার বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের মুখোমুখি হয়েছিল— গালিভরও প্রেসিডেন্ট ও উজির আযমের সাথে আলাপ করেছিল।

গালিভার্স ট্রাভেলস এর ছত্রে ছত্রে কৌতুক উপাদান। যেমন ঃ

ক. Fifteen hundred of the Emperor's largest horses, each about four inches and a half high, were employed to draw me towards the metropolish, which, as I said, was half a mile distant.[২০৫]

খ. Neither indeed could I forbear smiling at myself when the Queen used to place me upon her hand towards a looking glass by which our persons appeared before me in full view together."[২০৬]

গালিভরের সফরনামায় ও কৌতুক উপাদানের ছড়াছড়ি।

ক. রুমালে জড়াইয়া আমারে একজনের পাশ পকেটে ফেলিল। .....কোটের পাশ পকেট হইতে গলা বাড়াইয়া আমি পথঘাট ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিতে লাগিলাম।'[২০৭]

খ. আমি তা'রার মধ্যেকার সবচেয়ে বুড়ালোকটিকে কোলে তুলিয়া আলাপ করিলাম।[২০৮]

সবশেষে বলা যায়, সুইফট রূপক ও আয়রণি একীভূত করে সমকালের ইংলণ্ডের কথা বলেছিলেন—আবুল মনসুর আহমদ বলেছিলেন সমকালীন পাকিস্তানের কথা।

আদু ভাই

শুরুতে বলা হয়েছিল, সমাজ সচেতন আবুল মনসুর আহমদের একটি মাত্র রচনা কোন সুনির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে না। রচনাটি 'আদু ভাই'। 'আদু ভাই' রসরচনার পর্যায়ে পড়ে। ব্যঙ্গ রচনায় মানুষের অসংগতি, মুখোশের আড়ালের মুখটি ধরিয়ে দেয়া হয়। কোন মানুষের বুদ্ধির ঘাটতি নিয়ে ব্যঙ্গ করা চলে না—যদিও ব্যঙ্গের কিছুটা ছোঁয়া থাকতে পারে। অনেক বয়সের আদুভাই মোটাবুদ্ধির মানুষ। ক্লাশ সেভেন থেকে প্রমোশন লাভের অযোগ্যতা সম্পর্কে তিনি আদৌ সচেতন নন। ফলে অসচেতন আদু ভাই এর বিভিন্ন আচরণ হাসির উদ্রেক করে। এ'জাতীয় ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন কৌতুককর উপাদানগুলো নিয়ে রস রচনা সৃষ্ট হতে পারে। বলা বাহুল্য, আবুল মনসুর আহমদ করেছেনও তাই। 'আদুভাই' ব্যঙ্গ রচনা নয়, নিছক রস রচনা। আদুভাই'র প্রতিটি কথা ফালসিতে ভরা। তার ভ্রান্তিতে ভরা আচরণ ও বক্তব্য সকলের হাসির উদ্রেক করে। কয়েকটি উদাহরণ নেয়া হল।

ক : শিক্ষকরাও অনেকে তাকে 'আদুভাই' বলে ডাকতেন। কারণ নাকি এই যে, ওরাও এককালে আদুভাইর সহপাঠী ছিলেন, এবং সবাই নাকি ওই এক ক্লাশ সেভেনেই আদুভাইর সঙ্গে পড়েছেন।[২০৯]

খ : আজ হোক, কাল হোক প্রমোশন আমাকে দিতেই হবে। তবে হাঁ, উন্নতি আস্তে আস্তে হওয়াই ভালো। যে গাছ লক লক করে বেড়েছে, সামান্য বাতাসেই তার ডগা ভেঙেছে।[২১০]

গ : কিন্তু একটা বিশেষ কারণে এবার তাকে প্রমোশন পেতেই হবে। .....তা এই যে, আদু ভাইর ছেলে সে-বার ক্লাশ সেভেনে প্রমোশন পেয়েছে। ...ছেলের সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়তে তাঁর আপত্তি

ছিল না। কিন্তু আদু ভাইর স্ত্রীর তাতে ঘোরতর আপত্তি আছে। .....পড়াশোনা ছেড়ে দিলে আদু ভাই বাঁচবেন কি নিয়ে ?[২১১]

ঘ. আমি ক্লাশ সেভেনে পাশ করতে পারলাম না বলে ক্লাশ এইটেও পাশ করতে পারতাম না, একথা এঁদেরে কে বলেছে ? কোন কুগ্রহের ফেরেই আমি ক্লাস সেভেনে আটকে পড়েছি। একবার কোনোমতে এই ক্লাসটা ডিঙোতে পারলে আমি ভাল করতে পারতাম, এটা বুঝা মাষ্টার বাবুদের উচিত ছিল।[২১২]

ঙ. ছেলে আমাকে গোরস্তানে নিয়ে গেল। দেখলাম আদুভাইর কবরে খোদাই-করা মার্বেল পাথরের টেবলেটে লেখা রয়েছে ঃ

Here Sleeps Adu Mia who was promoted
from class VII to class VIII.

ছেলে বলল ঃ বাবার শেষ ইচ্ছামতই এ-ব্যবস্থা করা হয়েছে।[২১৩]

'আদুভাই-এর মত নিতান্ত হাসির রচনা আবুল মুনসর আহমদের সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই বললেই চলে। জাত ব্যঙ্গ স্রষ্টার পক্ষে নির্মল হাসির রচনা হয়তো সম্ভবও ছিল না।

মনসুরের শিল্পকৌশল, মানস ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গ

মানুষ যত শিক্ষিত হবে, তত তার বর্তমানের সংগে বিরোধ বাঁধবে এবং সেই বিরোধ ভাঙতে ভাঙতেই সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে। লেখকের হাতে সেই ভাঙ্গার হাতিয়ার ব্যঙ্গ।'[২১৪] The Satirist is nearly always a man who is abnormally sensitive to the gap between what might be and what is.[২১৫] একজন ব্যঙ্গকার সম্পূর্ণভাবে স্বনিয়োজিত ব্যক্তি। মূল্যবোধ, সত্য ও নৈতিকতা রক্ষার কাজে তিনি নিজেকে নিজে নিয়োগ করেন। He is a man (women satirists are very rare) who takes it upon himself to correct and ridicule the follies and vices of society and thus to bring contempt and derision upon aberrations from a desirable and civilised norm.[২১৬] একজন ব্যঙ্গকার, মানুষকে তার জীবনের কুৎসিত দিকগুলো ও অন্তরালের ঘটনাবলী দেখাতে চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন রাজনীতি ও কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির মত ও পথ পাল্টাতে।

একজন সত্যিকারের ব্যঙ্গস্রষ্টার প্রায় সবগুণ ছিল আবুল মনসুর আহমদের। মন্দিরে, মসজিদে, বক্তৃতার মঞ্চে, পলিটিকসের আখড়ায়, সাহিত্য সমাজে এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে বিচরণকারী মানুষের মুখোশ পরা বনমানুষদের ব্যঙ্গ করেছেন তিনি[২১৭] নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সংশোধনের চেষ্টা করেছেন সমাজের দোষত্রুটি, লোভ-লালসা তথা যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচার। কুৎসিত দিকগুলোর মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে—বাধ্য করেছেন মুখোশের অন্তরালের চেহারা দেখতে।

যে-সব ব্যক্তি ও প্রথার ওপর আবুল মনসর আহমদের ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নীচে তার একটা তালিকা দেয়ার চেষ্টা করা হলো।

> ইংরেজদের ভেদনীতি (divide and rule)' ভেদনীতির শিকার ইংরেজদের হাতের ক্রীড়নক হিন্দু-মুসলমান, কংগ্রেস-মুসলিম লীগ অনৈক্য, স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজ স্বার্থ অন্বেষণকারী, ব্যক্তি-স্বার্থোদ্ধারের জন্য স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী, তথাকথিত চরমপন্থী, পলায়নবাদী বিদ্রোহী, বাইরে বিদ্রোহী ভেতরে ইংরেজ ভক্ত দেশসেবার নামে আত্ম সেবাকারী আইনসভার সদস্য, স্বদেশী জমিদার, রাজনীতির নামে পকেটনীতি, দলবাজি, সমিতিবাজি,

ঘুণেধরা নেতৃত্ব, নির্বাচনি-প্রহসন, ভোট কেনা-বেচা, নমিনেশন ক্রয়-বিক্রয়, দল ত্যাগ, বিদেশী শাসকপ্রীতি, খেতাবের মোহ, শাসনতন্ত্রহীন শাসনব্যবস্থা, সরকারী সম্পত্তির অপব্যবহার, সরকারের নির্বাচন পেছানো, ঘন ঘন অধ্যাদেশ জারী, বিনা বিচারে আটকের প্রহসন, পারমিটবাজি, ঘুষ দুর্ভিক্ষ, চেতনার দুর্ভিক্ষ, দুর্ভিক্ষামলের মন্ত্রী -আমলা, গ্রো মোর ফুড আন্দোলনের কর্মকর্তা, দুর্ভিক্ষের কাল গ্রান্ড হোটেলে ভোজ, দুর্ভিক্ষ, ব্যবসায়ী-ফটকাবাজ, ব্যবসায়ে অনিচ্ছুক অসাধু বাঙালী, যুদ্ধ ব্যবসায়ী, লবণ সংকট, পীরপ্রথা, দরগা-ভক্তি, দরগার অনাচার, ভণ্ডপীর, লালসালু-ব্যবসায়ী, মোল্লাদের বিবাহ প্রীতি, মোল্লাদের ভোজনপ্রীতি, অজ্ঞতা মযহাবী বিরোধ, মোল্লাদের স্বার্থে মোহাম্মদী-মাযহাবী বিরোধের চক্রান্ত, বাহাসের অসারতা ও পরিণাম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারী, ক্ষুদ্রবিষয় নিয়ে ধর্মীয় কলহকরী, প্রতিদ্বন্দ্বী মৌলবীদের অশোভন সংঘর্ষ, অনাবশ্যক আরবী প্রীতি, শিক্ষাসংস্কারের নামে শিক্ষার ইসলামীকরণ, শিক্ষার আধুনিকতা বর্জন, পর্দাপ্রথা, ইসলামী মুখোশধারী নেতাদের স্ববিরোধ, সুন্নত পালনে বাড়াবাড়ি, ধর্মীয়-পত্রিকা-ব্যবসা, আঞ্জুমানজাতীয় সেবা-প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা, এস্তেখারা, মাওলানাদের ভাষা ব্যবহার, মুসলমানদের কাবুল প্রীতি, লীডরে-কওমদের রূপ।

আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গের ঝাঁঝ কেমন ? তাঁর সৃষ্টি সমূহ পুরোপুরি ব্যঙ্গ নাকি কিছুটা রঙ্গও ? নজরুল বলেছেন, 'সে ব্যঙ্গ যখন হাসায় তখন হয় সে ব্যঙ্গ কিন্তু কামড়ায় যখন, তখন হয় সে সাপ; আর সে কামড় গিয়ে যার গায়ে বাজে তার মুখের ভাব হয় সাপের মুখে ব্যাঙের মতই করুণ[২১৮]। আবুল মনসুর নিজে তাঁর রচনায় হাসির কথা বলেছেন; হাসির পেছনে কান্নার কথাও বলেছেন। একথাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু 'The main difficulty I believe is to distinguish the satirical from the comic-[২১৯] কমিক লেখক ব্যক্তির ত্রুটিগুলো প্রকাশ করে দেন "in the ease of his heart." যদিও যা দেখেন ও শোনেন তিনি তার ওপর মন্তব্য রাখেন এবং একেবারে নগ্ন করে দেয়ার ইচ্ছে তার থাকে না, কিন্তু ব্যঙ্গের কথা ভিন্ন। ব্যঙ্গকে ভদ্র চেহারা দেয়ার জন্য কিছুটা কৌতুক মেশাতে হয়। সাহিত্যে উচ্চস্থান পেতে হলে ব্যঙ্গকে একটুখানি ভদ্র চেহারার হতে হবে। কেননা ব্যঙ্গ যে গাল দেওয়া অথচ সোজা গাল দেওয়া নয়। কিন্তু ব্যঙ্গ রচনায় বা বাগবৈদগ্ধ মেশাতে হবে, তা রচয়িতার মানসিক গঠনের ওপর প্রচ্ছন্ন আক্রমণের কতটা প্রচ্ছন্ন রাখতে হবে তারও নির্দেশ

দেওয়া যায় না।[২২০] তাছাড়া ব্যঙ্গ রচনা পাঠে যদি দর্শক বা পাঠকের মনে ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যটির কোনো ছাপ না পড়ে, যদি তা হাস্যকৌতুকেই শেষ হয়, তবে তা ব্যঙ্গরূপে সার্থক নয় বুঝতে হবে। 'We must be prepared to find the writer of comedy losing his moral neutrality and slipping into satire and the satirist occassionally loosening his control over the reader and relanig into comedy.[২২১]

আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গ সম্পর্কে শেষোক্ত বাক্যটিই প্রযোজ্য। তিনি সোজা গাল কাউকেই দেননি যদিও তাঁর সেই সুযোগ ছিল। বিস্ময়করভাবে তিনি কোন ল্যাম্পুন, ইনভেকটিভ বা কোন বিশেষ ব্যক্তির কুৎসা কাহিনী রচনা করেননি। শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ রচয়িতার মতো তিনি ব্যঙ্গকে ভদ্র চেহারা দিয়েছেন রূপক ও আয়রণির দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে। সে সাথে বলা যায়, কৌতুক মনসুরের সব রচনাতেই আছে কিন্তু ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যকে তা কখনো ছাপিয়ে যায়নি।

এবারে 'হিউমার' এবং 'উইট' প্রসঙ্গ আসা দরকার।

প্রথমে 'হিউমার' প্রসংগ। "জীবনের প্রতি সমবেদনাশীল দৃষ্টি, সকলের প্রতি এক উদার সমদর্শিতা, চিন্তাশীলতার সহিত আমোদ প্রিয়তার, এক মিশ্রিত অনুভূতি এইগুলিই হইল হিউমার এর বৈশিষ্ট্য।"[২২২] 'হিউমার এ আমরা হাসি বটে কিন্তু সংগে সংগে সুগভীর বেদনার সুতীক্ষ্ণ কন্টক সুতীব্রভাবে আমাদের অন্তকরণ বিদ্ধ করিয়া দেয়।[২২৩] হিউমার এর হাসি প্রবল এবং উতরোল নহে, ইহা মৃদু এবং অনুচ্চ। হিউমারের হাসিতে আনন্দময় অন্তরের অবারিত উচ্ছ্বাস দেখা যায় না। এই হাসির স্রোতের বিরুদ্ধে এক অন্তঃশায়ী বেদনার প্রতিকূল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সেই প্রতিকূল স্রোতের প্রতিক্রিয়ায় হাসির বেগ বাধাপ্রাপ্ত ও মন্দীভূত।"[২২৪]

আবুল মনসুর আহমদ স্যাটায়ারিষ্ট ছিলেন, হিউমারিষ্ট ছিলেন না। হিউমারিষ্ট-এর সমবেদনাশীল দৃষ্টি স্যাটায়ারিষ্ট এর থাকে না। বলে আবুল মনসুরের হাসি মৃদু এবং অনুচ্চ নয়। তবু সুগভীর বেদনার সুতীক্ষ্ণ কন্টক সুতীব্রভাবে আমাদের অন্তঃকরণ বিদ্ধ করে বলে কিছু কিছু রচনায় হিউমার এর স্পর্শ পাওয়া যায়। তাঁর সায়েন্টেফিক বিবিনেস ও মডার্ণ ইব্রাহীম গল্পে শক্তিশালী হিউমারিষ্টের সব লক্ষণ মেলে।

বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্যরস হল 'উইট'। 'হিউমারের অবস্থান সহানুভূতিশীল হৃদয়ে। উইট এর আবেদন বুদ্ধিশীল মস্তিষ্কে।"[২২৫] The man of wit the conciously entertaning person of lively speech and quick intelligence is usually a solemn fellow at the heart[২২৬]

বৈদগ্ধ্য পূর্ণ হাস্য রস আবুল মনসুর আহমদের গল্পের প্রধান রস নয়।[২২৭] তার গল্পে শব্দের মার প্যাচ বা শব্দের খেলা নেই বললে চলে। তবে যুক্তির মারপ্যাচ তাঁর গল্পে প্রচুর। এবং যুক্তির মারপ্যাচ অধিকাংশ সময় ফ্যালাসির মারপ্যাচ বলে কৌতুক জমে ওঠে চমৎকারভাবে। ফ্যালাসি প্রসংগ পরে আলোচিত হবে। তার আগে শব্দের মার প্যাচ প্রসংগে আরো কিছু কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। অনুপ্রাস, শ্লেষ, Antithesis, Paradon, oxymoron উইট লেখকের ইত্যাকার শাণিত অস্ত্রগুলোর মধ্যে শ্লেষ ছাড়া অন্য অস্ত্রসমূহ খুব একটা ব্যবহৃত-হয়নি। তবে একেবারেই যে ব্যবহৃত হয়নি, তাও নয়। যেমন ঃ—

১. কপালে দুঃখ আছে মরিব কেন ?[২২৮]—এ ধরনের অলংকার (বিরোধাভাস) সাধারণ কলমের হাতে বের হয় না।

২. হামিদ রাগে অপমানে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, এ খাজাবাবার বিচার নয় স্যার, এ রাজাবাবার বিচার।[২২৯]—এখানে শুধু অনুপ্রাস নয়, অনুপ্রাসের অতিরিক্ত খোঁচাও আছে।

৩. প্রাতঃস্মরণীয় প্রথম গান্ধীর সময় দেশবাসী স্বরাজ করিত; তাঁরই আদর্শ ধরিয়া আমরা আজ বিরাজ করিতেছি।[২৩০]—অনুপ্রাস

৪. 'ভ্রাতৃগণ দেশের জনসাধারণের কোন দোষ নাই; তাদের হার্ট খুব সাউন্ড আছে; বরঞ্চ হাঁপানিতে তাদের হার্টের সাউন্ড বাড়িয়াই গিয়াছে।[২৩১] যমক। প্রথম সাউন্ড—নিরাপদ, দ্বিতীয় সাউন্ড-আওয়াজ

৫. দ্বিতীয়তঃ আমার নিজের লোকজন কৃষক প্রজারাই যখন আমার পক্ষ হইতে প্রতিদিন লাখে লাখে প্রাণত্যাগ করিতেছে তখন আমার নিজের প্রাণত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা কোথায় ?[২৩২]—যমক। প্রথম প্রাণত্যাগ—অভাবে মৃত্যুবরণ, দ্বিতীয় প্রাণত্যাগ—স্যাকরিফাইস।

আবুল মনসুর আহমদের রচনা কৌশল এবারে সংক্ষেপে আলোচিত হবে। গল্প আলোচনা প্রসংগে দেখা গেছে তিনি বিভিন্ন গল্পে রূপক, প্যারডি এবং বিবিধ কৌতুককর উক্তি ও পরিস্থিতি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।

মনসুরের সার্থকতম রূপক অথ কুত্তাশিয়াল চরিতামৃত ও গালিভরের সফরনামা। রূপক গল্প নির্মাণে অসাধারণ দক্ষতা সত্ত্বেও কয়েকটি গল্পে তিনি তাঁর ক্ষমতাকে পুরো কাজে লাগাতে পারেননি—এ কথা আগে বলা হয়েছে। একাধিক গল্পে দেখা গেছে রচনার প্রথম পরিচ্ছেদ তিনি বাস্তবে বিচরণ করেন—তারপর কল্পনায় একটি কাহিনী বর্ণনা করেন এবং রূপকার্থ আরোপ

করেন। এতে রূপকের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবে তাঁর সার্থকতা এখানে যে, সাধারণতঃ অধিকাংশ লেখক প্রচলিত কেস্সা কাহিনীর মধ্যে রূপকার্থ আরোপ করেন; কিন্তু তিনি নিজে কাহিনী বানিয়ে রূপকার্থ আরোপ করেছেন।

আবুল মনসুরের সার্থক প্যারডি গালিভরের সফরনামা ও ছহি বক্ত ওযারতনামা। এগুলো ছাড়াও কিছু রচনায় বিশেষ করে বিদ্রোহী সংঘে তিনি প্যারডির উপাদান ব্যবহার করেছেন।

শোন ইংরাজ
আজ হতে আমি বিদ্রোহী, আমি উন্মাদ!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!
আমি মুক্ত, আমি সত্য, আমি বিদ্রোহী সৈন্য!
আমি ধন্য! আমি ধন্য!!
মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।
যবে চাকুরীর আশে বাঙালী ফিরিঙ্গির পায়ে ধরিবে না।
আর ট্রাম কোম্পানী ভাড়া চাহিবার দুঃসাহস করিবে না।[২৩৩]

নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার অংশবিশেষের প্যারডি ক'রে বিদ্রোহী-সংঘের অন্যত্রও তিনি চমৎকার হাস্যরস পরিবেশন করেছেন।

মনসুর-সৃষ্ট অধিকাংশ চরিত্রের কৌতুককর উক্তিতে একটা যুক্তির মুখোশ আছে এবং অধিকাংশ যুক্তিই ফ্যালাসিতে ভরা। ফ্যালাসির ব্যবহার মনসুরের রচনার একটা সাধারণ লক্ষণ। তর্কশাস্ত্রে ইগ্নোরেশিও এলেঞ্চি (অবান্তর তর্ক), ফ্যালাসি অব ইল্লিচিট জেনারেলাইজেশন, ফ্যালাসি অব নন-অব-জার্ভেশন, মেথড অব কনকমিটেন্ট ভেরিয়েশন[২৩৪] ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ফ্যালাসি দেখা যায়। আবুল মনসুরের রচনা থেকে মেথড অব কনকমিটেন্ট ভেরিয়েশন-এর একটি উদাহরণ নেয়া যাক। আপনারা যাকে খাদ্য সমস্যা বলছেন ওটাকে আমি সমস্যা হিসেবে দেখছি না—ওটা আসলে একটা মূল্যবৃদ্ধি মাত্র। জিনিষের দাম বাড়ে দেশবাসীর ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পেলে। আমাদের দেশে চালের দাম বেড়ে চার টাকার জায়গায় চল্লিশ টাকা মণ হয়েছে, তাতে বুঝতে হবে বাঙালির ক্রয়শক্তি দশগুণ বেড়ে গেছে।[২৩৫] অনুমানটি হচ্ছে, চালের দাম বাড়ছে আর সেই সঙ্গে ক্রয় শক্তিও বাড়ছে। কাজেই দ্বিতীয়টি প্রথমটির কারণ। কিন্তু যেহেতু দৃষ্টান্ত গুলো নিরীক্ষণের সাহায্যে পাওয়া নয়, কাজেই অনুমানটি

সুনিশ্চিত নয়, সম্ভাব্য মাত্র। অথবা সম্ভাব্য যুক্তিকেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিসেবে চালিয়ে দেয়া হল।

চরিত্র সমূহের এ'জাতীয় অবান্তর তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে অধিকাংশ গল্প এগিয়ে গেছে। এবং চরিত্রসমূহের অবান্তর সংলাপে ব্যঙ্গ নিহিত। তবে কিছু সংলাপ-বিতর্ক অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ। দীর্ঘ হলেও এটা মানতে হবে যে চরিত্রগুলোর তর্ক করবার ক্ষমতা অসাধারণ। হোক না সেগুলো ফ্যালাসিতে ভরা। লেখকের ওকালতি-অভিজ্ঞতা সম্ভবত : কাজে লেগেছে।

আবুল মনসরের ব্যঙ্গ গল্পে ঘটনার ঘনঘটা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ ব্যঙ্গ গল্পে হয়তো মানা সম্ভব নয়। বরং কৌতুকতর পরিস্থিতি উদ্ভাবন ব্যঙ্গ গল্পের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মনসুরের ঘটনা-উদ্ভাবনী শক্তি তুলনাহীন। এ প্রসঙ্গে তাঁর পর্যবেক্ষণী শক্তির ও প্রশংসা করতে হয়। প্রচুর পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির মাধ্যমে তিনি কোন কিছুর অসারতা প্রমাণ করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ আসমানী পর্দা পড়লেই এ কথার সত্যতা মিলবে। পর্দা-প্রথার অসারতা প্রমাণের জন্য কত যে কৌতুককর পরিস্থিতি উদ্ভাবিত হয়েছে এবং কত যে যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে তা শুধু পড়লেই বোঝা যাবে। প্রসঙ্গত এখানে অতিরঞ্জনের প্রশ্ন এবং চরিত্রের অনেকগুলো দিক এড়িয়ে যাওয়ার নিয়মের কথা আসতে পারে—আসতে পারে সরলীকরণের প্রশ্ন। কিন্তু এ সব প্রশ্ন ব্যঙ্গ গল্পের প্রসঙ্গে পুরোপুরি অবান্তর না হলেও, কিছুটা অচল। ব্যঙ্গ গল্পে অতিরঞ্জন স্বীকৃত।

মনসুরের কিছু গল্পে স্বপ্নচারণ রয়েছে। 'গো দেওতা কা দেশ' ও 'ধর্মরাজ্য' স্বপ্নচারণের বড় উদাহরণ।

অনেক গল্পে সভা বসে—দরবার বসে। সভায় বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিরা কথা বলে। কথকের কাজ যেন সভার বিবরণ দেয়া। এ কথা 'অথকুত্তাশিয়াল চরিতামৃত', 'শিক্ষা সংস্কার,' 'আসমানী পর্দা, ফুডকনফারেন্স ও আরো অনেক রচনা সম্পর্কে প্রযোজ্য। এসব রচনায় দরবারী পরিবেশ বা আদালতের পরিবেশ আসে তবে বৈঠকী মেজাজ বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু আসে না।

কিছু রচনায় নাটকের আকার আছে। যেমন 'অথকুত্তাশিয়াল চরিতামৃত' শিক্ষা সংস্কার, আসমানী পর্দা ইত্যাদি। লেখকের ভূমিকায় এগুলোকে 'নাট্যচিত্র' বলা হয়েছে। এ'সব রচনায় নাটকের মত পাত্রপাত্রীর সংলাপ (যদিও দীর্ঘ) এমন কি দৃশ্যাবলীও রয়েছে। তবে নাটকের আকার থাকলেও এ'গুলোর কোনটাই নাটক হয়ে উঠেনি। হয়তো লেখক তা চানওনি। আসলে এগুলো নাটক নয় নাট্যচিত্রই।

নাটক বনাম নাট্যচিত্র প্রসঙ্গে ব্যঙ্গগল্প বনাম ব্যঙ্গ চিত্র অথবা নক্‌শার প্রসঙ্গ আসতে পারে। লেখক স্বয়ং এবং তাঁর গ্রন্থের প্রকাশক তাঁর অনেক রচনাকে নক্‌শা বলেছেন। সত্যিকার অর্থে তাঁর শিক্ষা-সংস্কার, রাজনৈতিক ব্যাকরণ ইত্যাদি আরো অনেক রচনা নক্‌শার পর্যায়ে পড়ে। এসব রচনায় ব্যঙ্গ আছে ঠিকই—তবে গল্পে একমুখিতা এবং পরিমিতি রক্ষিত হয়নি বললে চলে।

আবুল মনসুর আহমদের আসল অস্ত্র আয়রণি। আয়রণির এত সার্থক ব্যবহার বাঙলা সাহিত্যে দুর্লভ বলা চলে। তাঁর প্রত্যেকটি ব্যঙ্গ রচনাতেই আয়রণের ব্যবহার রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপক আর আয়রণিকে তিনি একীভূত (fused) করেছেন, সে কথাও আগে আলোচিত হয়েছে। এখানে আর একটি উদাহরণ নেয়া হবে 'ধর্মরাজ্য' থেকে। লাট সাহেবকে কথক বলছে...'খোদাকে ধন্যবাদ, আপনি একদিন আগে আসেন নাই। আসিলে গোটা বাঙালী জাতি এমন করিয়া নিঃশেষে প্রাণদান করিতে পারিত না।'[২৩৬] কথক জানে লাট সাহেব ইচ্ছে ক'রে একদিন আগে আসেননি। "কথক এও জানে লাট সাহেব দাঙ্গার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং মানুষের মৃত্যুতে আনন্দিত। তাছাড়া, কথক ভাল করেই বোঝে যারা প্রাণ দিয়েছে তারা ঠিক ধর্মের জন্য নয়, ধর্মের সাধারণ খুঁটিনাটির জন্য প্রাণ দিয়েছে। এবং কথক বোঝে এ'প্রাণদান 'স্যাক্রিফাইস' বা 'শাহাদাত' পর্যায়ে পড়ে না। নিঃশেষ প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই—এ জাতীয় বাক্যও এখানে অচল। এ মৃত্যুতে ক্ষয়ই একমাত্র সত্য। অথচ কথক বলে গেল উল্টো। কিন্তু উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝতে সহৃদয় পাঠকের মোটেও অসুবিধে হয় না। আয়রণির এমন ব্যবহার বাঙলা সাহিত্যে খুব সলভ কি ?

আবুল মনসুর আহমেদ শব্দ, বাক্যাংশ এবং প্রবাদ প্রবচন ব্যবহারেয় যথেষ্ট মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। তাঁর শব্দ ব্যবহার প্রকৃত ব্যঙ্গ স্রষ্টারই শব্দ ব্যবহার। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে 'হুজুর কেবলার' এমদাদ পাম্পশুগুলি বাবুর্চিখানার বটি দিয়া কোপাইয়া ইলশাকাটা করিল"। 'ইলশাকাটা করিল' বাক্যাংশের ব্যবহার শুরুতেই ব্যঙ্গের ইঙ্গিত দিতে সক্ষম। তাছাড়া জন্যকোন বাক্যাংশ বা শব্দ সমষ্টি হয়তো বর্ণনায় এত জোর আনতে পারত না। শব্দ ব্যবহারের আরেকটি মাত্র উদাহরণ নেয়া যাক ফুডকনফারেন্সের 'লঙ্গরখানা' গল্প থেকে। হাম দেশ কা মওজুদ চাউল বাহার করবার মতলবে অনেক পুলিশ লাগিয়েছে। নগর সাকসেসফুল হতে পারছি না। সো হাম এই ফন্দি নেকাল করেছি। হাম আগার ইচ্ছা করত তব যুলুম করেও চাউল নেকালতে পারত।'[২৩৭] উর্দুওয়ালাদের অভূতপূর্ব বাঙলা ব্যবহারের এমন সার্থক নযির সৃষ্টি সহজ কাজ নয়। বাঙলা উর্দু মেশানো ছাড়াও, উর্দুওয়ালারা যে

উর্দুক্রিয়ার সাথে বাঙলা বিভক্তি ব্যবহার করে ভাষার খিচুড়ি বানাতেন তারও নমুনা উদ্ধৃতির 'নেকালতে' শব্দটিতে আছে। একদিকে উর্দু ক্রিয়া 'নেকাল' তার সাথে বাঙলা বিভক্তি'তে'। প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য যে, দুর্ভিক্ষামলের অন্যতম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তথাকথিত বাঙালি নাযিমুদ্দীন। মনসুরের শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা এখানে যে, নামোল্লেখ না থাকলেও নাযিমুদ্দীনকে চিনতে সচেতন পাঠকের মোটেও অসুবিধে হয় না।

শব্দ-ব্যবহার প্রসঙ্গে মনসুরের 'ভাষা বিতর্কে'র কথা অনেক পাঠকের মনে আসতে পারে। আবুল মনসুর আহমদ একসময় পাক বাঙলার কালচার (১৯৭২) পাক বাঙলার ভাষা (১৯৫৮) ইত্যাকার প্রবন্ধ লিখে ও 'পাক বাঙলার কালচার' (১৯৬৬) শীর্ষক প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাদেশের (পূর্ব-বাঙলার) মুসলমানদের ভাষা কৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্যের কারণে বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে তাঁর 'ভাষা বিতর্ক' আলোচিত হয়নি। অন্যতম কারণ, তাঁর গল্পে বা নকশায় দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর প্রস্তাবিত ভাষা ব্যবহৃত হয়নি। তাঁর দু'একটি চরিত্র আঞ্চলিক ভাষার কথা বলে। কোন কোন চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষাতো এমনিতেই আসতে পারে। তবে তাঁর কিছু চরিত্র চলতি বাঙলায় কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ করে আপনাদের, তাদের ও আমাদের অর্থে 'আপনেরার', 'তারার', 'আমরার' ইত্যাকার সর্বনাম ব্যবহার করেছে। নিঃসন্দেহে এ' সর্বনামগুলো ময়মনসিংহ অঞ্চলের। পূর্ববঙ্গের তথা বাঙলাদেশের ভাষার স্বাতন্ত্র্য সচেতনভাবে নির্মাণ করতে হলে শুধু ময়মনসিংহ অঞ্চলের কিছু সর্বনাম বা ক্রিয়ার ব্যবহারই যথেষ্ট নয়।

এবারে মূল আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক। আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গের ঝাঁঝ কেমন ছিল – ঐ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল আগে। এতক্ষণের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে, মনসুরের ব্যঙ্গে কশাঘাতের সাথে রসাঘাতও ছিল যথেষ্ট। তাছাড়া, দর্শকদের প্রচুর হাসিয়েছেন' এবং 'হাসির পেছনে কান্নার' যে দাবী তিনি করেছেন, তাও সঠিক পাশ্চাত্যের সাহিত্য ঝাঁঝ অনুসারে ব্যঙ্গসমূহকে 'জুভেনালী ব্যঙ্গ' এবং 'হোরেসী ব্যঙ্গ' এ' দু ভাগে ভাগ করা হয়। 'Horace is the tolerant, urbane and amused spectator of the human scene; Juvenal is bitter misanthropic and consumed with indignation'।[৩৮] হোরেস নরমপন্থী – জুভেনাল চরমপন্থী। পোপের কিছু রচনা 'হোরেসী' আবার কিছু রচনা 'জুভেনালী' ধরনের। আবুল মনসুর আহমদকে পোপের দলে ফেলা যায়, তাঁর মডার্ণ ইব্রাহিম 'হোরেসী' আর সায়েন্টিফিক বিবিনেস' জুভেনালী ব্যঙ্গ।

প্রসংগত, ব্যঙ্গ রচনা করে অনেক লেখক প্রচুর গাল শুনেছেন। সুইফট

'নরবিদ্বেষী' বলে আখ্যায়িত হয়েছেন বহুবার। আবুল মনসুর আহমদ, 'সায়েন্টিফিক বিযিনেস', 'গালিভরের সফরনামা' প্রভৃতি রচনায় যেভাবে বাঙালী জাতিকে আক্রমণ করেছেন—তাঁকে নরবিদ্বেষী না হোক, বাঙালী-বিদ্বেষী বলে অনেকেই ভুল বুঝতে পারেন। আল্লাহতায়ালা যখন দোযখের ওপর মাটি চাপা দিয়ে দুনিয়া আসমান থেকে বাঙালী জাতির নাম মুছে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন সমস্ত বাঙালি জাতি হায় হায় করে উঠল। শেষবারের মত চেষ্টা করতে গিয়ে মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার বললেন ঃ হে সদাপ্রভু, সমস্ত দোষ আমাদের। তোমার দয়ার দাবি আমরা আর করতে পারি না। বেহেস্তের আশাও আমরা করি না। কিন্তু কেরানি-চাপরাশির জাত আমরা' কেরানি—চাপরাশিগিরি ছাড়া বাঁচব না। আমাদেরে তুমি দয়া করে দুযখের কেরানি—চাপরাশি করে দাও। সেখানেত বিযিনেস করবার মত কোন জিনিস নেই।'[২৩৯] বলা বাহুল্য, সমস্ত বাঙালী জাতির জন্য আসলে লেখকের মনও হায় হায় করে কেঁদে উঠেছিল। বাঙালি জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক—এটা তিনি চাননি ব'লেই অন্তত দোযখে হলেও, তাদের জন্য ঠাঁই কামনা করেছিলেন। তাছাড়া, গালিভরের সফরনামার 'দেও-এর দেশ' অংশে গালিভর কতগুলো প্রশ্ন করেছিল ঃ

ক ঃ খাদ্যদ্রব্য লইয়া দেশে এমন ঠকামি হয় ?

খ ঃ কেন, আপনেরার দেশে কোন শাসনতন্ত্র নাই ?

শাসনতন্ত্রহীন শাসনব্যবস্থা দেখে, তাঁর মন যে কেঁদে উঠেছিল, এতে কি কারো সন্দেহ আছে ?

তিনি কি মোল্লা-বিদ্বেষী ছিলেন ? নাসিরুদ্দীনের সাথে লেখকের কথোপকথন শোনা যাক। "তিনি (মনসুর) বললেন, আমি সমাজের কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যা লিখব, তাতে রক্ষণশীল দলের লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে।"[২৪০] আবুল মনসুর আহমেদ, মোল্লাদের বিরুদ্ধে নয়, গোঁড়ামির বিরুদ্ধেই লিখতে চেয়েছিলেন। মোল্লাকে নয় মোল্লাকিকেই খতম করতে চেয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি 'লীগ এগেন্‌স্ট মোল্লাইজম' প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।[২৪১] গোঁড়া মোল্লাদের বাড়াবাড়ি ও ভুল তিনি সচেতনভাবে শোধরাতে চেয়েছিলেন, "আমার মনে হয়, মুসলমানদের ধর্মীয় নেতারাই এই ধরনের ভুল করিয়াছেন সবচেয়ে বেশী। এরা নামায রোযা-ওজু-গোসল ও তস্‌বিহ তেলাওয়াতকে ধর্মের ফান্ডামেন্টাল খাড়া করিয়া ঐ সব দিয়া মুসলমানদের আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এটা করিতে গিয়া তাঁরা নিজেদের যুক্তির ফাঁদে নিজেরাই ধরা পড়িয়াছেন। যার ফলে নামাযে বুকের উপর ও নাভির নীচে তহরিমা বাঁধা লইয়া, জানাযার

নামাযে মাইয়াতের বুক বরাবর বা শির বরাবর দাঁড়ান লইয়া, বার তকবীর লইয়া ছয় তকবীর লইয়া, জোরে বা আস্তে আমিন বলা লইয়া মুসলমানে মুসলমানে খুনাখুনি ঘটাইয়াছেন। এর প্রতিকার একমাত্র টলারেন্স। কিন্তু টলারেন্সকে এঁরা ভয় পান এই জন্য যে, তাতে ধর্ম থাকে বটে, কিন্তু ধর্মীয় দল থাকে না।[২৪২] অন্যত্র লিখেছেন, "ইসলামের ভাল আদর্শ ত্যাগ করিয়া মুসলমানরা শুধু আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই ধর্ম-সাধনাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। .....মুসলমানদের এই সার্বিক অধঃপতনের জন্য দায়ী মোল্লারা।.....দুনিয়ার ধন-দৌলত কাফেরদের জন্য, মুসলমানদের জন্য বেহেশতে বালাখানা ও হুর-গিলমান অপেক্ষা করিতেছে, ইত্যাদি কুপ্রচারণা করিয়াই মুসলমানদের বিপথ-গামী করিয়াছে। .....ডাঃ লুৎফর রহমান, এস. ওয়াজেদ আলী, নযরুল ইসলাম, কাযী আবদুল ওদুদ, হুমায়ুন কবির, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ও আমি চুটাইয়া মোল্লা বিরোধী অভিযান শুরু করিলাম, এটাই আমার আয়নার যুগ। .....সওগাতকে কেন্দ্র করিয়া একটা বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন শুরু করিলাম। আমাদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও ঢাকা হইতে.... 'শিখা' সম্প্রদায় একই আন্দোলন শুরু করিলেন"।[২৪৩] দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত সমূহ থেকে মনসুর-মানস সহজেই বোঝা যায়।

আবুল মনসুর আহমদ বাঙালী-বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন বুদ্ধির মুক্তি (ঠিক ঘোষণা দিয়ে নয়), সার্বিক চেতনার দুর্ভিক্ষের অবসান। একজন ব্যঙ্গকার রক্ষণশীল দলের হয়ে প্রগতিশীলদের ব্যঙ্গ করতে পারেন; আবার প্রগতিশীল দলের হয়ে রক্ষণশীলতাকেও ব্যঙ্গ করতে পারেন। আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন প্রগতিশীল দলের ব্যঙ্গকার—সমাজ সচেতন ব্যঙ্গকার—রাজনীতি সচেতন ব্যঙ্গকার। শহীদ আখন্দ লিখেছেন, "অন্তত বাঙলা ভাষায় রাজনৈতিক জীবন ও কর্মধারা নিয়ে সফল ব্যঙ্গ রচনা তাঁর হাতেই প্রথম সম্পন্ন হয়। এদিক দিয়ে তিনি একক এবং বিরল কৃতিত্বের অধিকারী[২৪৪] এ মন্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই বললে চলে। সমাজ-রাজনীতি-ধর্ম নিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যঙ্গ রচিত হয়েছে সন্দেহ নেই। প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু (পরশুরাম) প্রমুখ সাহিত্যিকগণও বিচ্ছিন্নভাবে সমাজ সচেতন ব্যঙ্গ রচনা করেছেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে সমাজ-রাজনীতি-ধর্মের বিভিন্ন মুখোশ উন্মোচন করে আর কেউ ব্যঙ্গ রচনা করেননি। "প্রমথ চৌধুরীর হাসিতে কোন স্থায়ী প্রভাব ও গভীর উদ্দেশ্য পরিস্ফুটসহ।.....তিনি একটি উন্নাসিক বুদ্ধি সর্বস্ব দৃষ্টি লইয়া জীবনের প্রতি গভীর আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তির সমালোচনা করিয়াছেন।"[২৪৫] সমাজ কল্যাণ বা লোকশিক্ষার জন্য সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর দায় নেই।[২৪৬] তবে এও সত্য, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও প্রথম চৌধুরীর বক্রদৃষ্টি মাঝে মাঝে "আমাদের মূঢ়তা ও জড়তার প্রতি" আমাদের

অতীত বিলাসী প্রগতিবিরোধী জীর্ণ ও প্রবীণ মনোভাবের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছে।[২৭৪] শ্রেষ্ঠ হাস্য রসিক পরশুরাম কি করেছেন? "তাঁহার হাসির আঘাত কখনও তীব্র ও কঠোর হয় নাই এবং সেই আঘাতের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত কখনো ধরা পড়ে না।.....কচি ও বুড়া, সেকেলে ও একেলে সকলকে লইয়াই তিনি একটু হাস্য পরিহাস করিয়াছেন। সেজন্য সকলেই একটু আধটু ঘা ও খোঁচা খাইয়াছেন বটে কিন্তু কাহারও আপত্তি ও অভিযোগ করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। .....ভণ্ড ও প্রতারক চরিত্রের প্রতিও কিন্তু লিখকের কোন অতিশয়িত বিদ্বেষ নাই। সেজন্য ধরা পড়িবার পরও বিরিঞ্চি বাবার প্রতি কোন কঠোর শাস্তি বিধান তিনি করেন নাই।"[২৪৮] আবুল মনসুরের এমদাদ' হুজুর কেবলার দাড়ি ও বাড়ি ধরে টান দিয়েছিল; হামিদ খাজা বাবার দরগায় প্রকাশ্য বিদ্রূপ করেছিল, হুজুর কেবলা এবং 'খাজাবাবা'র সাথে বিরিঞ্চি বাবার তুলনা করলেই মনসুরের সাথে পরশুরামের পার্থক্য সহজে বোঝা যাবে। তুলনা করতে গেলে সূক্ষ্মতার প্রশ্ন আসতে পারে। প্রমথ চৌধুরী এবং পরশুরামের ব্যঙ্গ পরিহাস তুলনামূলকভাবে সূক্ষ্ম মনসুরের ব্যঙ্গ-পরিহাস একটু রূক্ষ্ম। তবে তাঁর রূক্ষ্মতাকে দক্ষতা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে জোনাথন সুইফট তাঁর আদর্শ ছিলেন বলে মনে হয়, যদিও সুইফটের ব্যঙ্গও ছিল সূক্ষ্মতর। আবুল মনসুর বাঙলা সাহিত্যের সুইফট। ১৯৭৯ সালের ১৮ই মার্চ তাঁর মৃত্যুর পর ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় কলামে লেখা হয়েছিল "আয়না ও ফুডকনফারেন্সের স্রষ্টা আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন সেদিনের বাঙলার জাতীয় জাগরণের এক নূতন জোনাথন সুইফট। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের শাণিত কশাঘাত সেদিন বাঙলার জাগ্রত মানসকে সকল কলুষ ও কালিমা হইতে মুক্ত করিয়াছিল।"[২৪৯]

আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের শাণিত কশাঘাত আজকের বাঙালী মানসকে কি কলুষ ও কালিমা থেকে মুক্ত করতে পারবে? উত্তরে বলা যায়, অবশ্যই। বিচারের বাণী এখনও নীরবে নিভৃতে কাঁদে; শাস্তির ললিতবাণী এখনও ব্যর্থ পরিহাস হিসেবে শোনায়; এখনও মন্দিরে, মসজিদে, আখড়ায়, বক্তৃতার মঞ্চে 'খাজা বাবা' 'হুজুর কেবলা, কুত্তায়ে বাঙলা'দের দেখা যায়—কখনো ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন মুখোশে—অনেক সময় অবিকল আগের মতো। তাছাড়া, বিদ্রোহী সংঘ জাতীয় রচনা সহজে কালের গণ্ডি অতিক্রম করেছে। কেননা, এ রচনায় সমকালীন রাজনীতি এলেও, আসলে চির-ন্তন পলায়নবাদীরাই ব্যঙ্গের শিকার হয়েছে।

সুইফট লিখেছিলেন Satire is a sort of glass wherein beholders do generally discover everybody's face but their own...[২৫০] আবুল

মনসুরের আয়নার ফ্রেম এমন মজবুত যে সে আয়নায় লেখকের সমকালের চরিত্রসমূহের মুখ এখনও পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। বলা প্রয়োজন, সে মুখগুলোকে এখনও বড় চেনা মনে হয় এবং বলা বাহুল্য, সুইফটের দেশের 'আয়না'র মতো আবুল মনসুর আহমদের আয়নায়ও সম্ভবতঃ কেউ নিজের মুখ দেখে না—দেখলে দেশের এমন দুর্দশা কখনও ঘটত না।

দেশে একটি নতুন 'আয়না'র প্রয়োজন—যে আয়নায় প্রত্যেক পাঠক নিজের মুখও দেখতে পাবে। প্রসংগত, দীর্ঘজীবী আবুল মনসুর আহমদ স্বয়ং সে ধরনের নতুন আয়না হয়তো পাঠকদের উপহার দিতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৫৪ সালের পর তিনি ব্যংগ রচনার আসর থেকে বিস্ময়কর-ভাবে দূরে সরে যান। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা ও পরবর্তীকালের রাজনীতি-বিদ, সমাজ সংস্কারকদের ব্যংগ করবার ভার তিনি অন্যের ওপর ছেড়ে দেন।

তথ্যনির্দেশ

১ আবুল মনসুর আহমদ, আত্মকথা (ঢাকা, ১৯৭৮) পৃষ্ঠা ২৮৩-২৮৮।

২ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯।

৩ মহিউদ্দিন আহমদ, প্রকাশকের নিবেদন, ফুডকনফারেন্স (ঢাকা, ১৩৭৮)

৪ নজরুল ইসলাম, 'আয়নার ফ্রেম', আয়না (ঢাকা, ১৯৭৮)।

৫ আবুল মনসুর আহমদ, 'আবুল কালাম শামসুদ্দিন করকমলেষু' আয়না (পূর্বোক্ত)।

৬ পূর্বোক্ত আইনুল হক খাঁকে, ফুডকনফারেন্স (পূর্বোক্ত)

৭ ঐ উৎসর্গপত্র, গালিভরের সফরনামা (পূর্বোক্ত)

৮ আবুল কালাম আযাদ 'India wins freedom' আনিসুজ্জামানের মুসলিম-মানস ও বাঙলা সাহিত্যে (ঢাকা, ১৯৬৪) উদ্ধৃত, পৃঃ ১০২।
"They saw that the British Goverment was using the Muslims against India's political struggle and the Muslims were playing the Goverment's Game."

৯ বদরুদ্দীন উমর, 'ভারতবর্ষে বৃটিশের ক্ষমতা হস্তান্তর, সাম্প্রদায়িকতা (ঢাকা, ১৩৭৭), পৃ. ৮০

১০ আবুল মনসুর আহমদ, 'অথকুত্তাশিয়াল চরিতামৃত', গালিভরের সফরনামা. পৃ. ১৫৯-১৬০

১১ পূর্বোক্ত পৃ. ১৬৭

১২ ,, ,, ১৭০

১৩ ,, ,, ১৭০

১৪ ,, ,, ১৬১

১৫ ,, ,, ১৬৮

১৬ ,, ,, ১৭৫

১৭ ,, ,, ১৭০

১৮ ,, ,, ১৫৬

১৯ ,, ,, ১৫৬

২০ আবুল মনসুর আহমদ, 'ছহিবড় ওয়ারতনামা' আসমানী পর্দা (ঢাকা ১৯৭১), পৃ. ১৩৬,,

২১ পূর্বোক্ত পৃ. ১৩৭

২২ ,, ,, ১৩৭

২৩ ,, ,, ১৩৭

২৪ ,, ,, ১৩০

২৫ ,, ,, ১৩১

২৬ ,, ,, ১৩১

২৭ ,, ,, ২৩১

২৮ ,, ,, ১৪০

২৯ আবুল মনসুর আহমদ, 'ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি, আসমানী পর্দা', পৃ. ১২৮।

৩০ পূর্বোক্ত পৃ. ৯৫

৩১ আবুল মনসুর আহমদ, 'ত্রিযুগমিতি' আসমানী পর্দা, পৃ. ১০২।

৩২ আবুল মনসুর আহমদ, 'বিদ্রোহী সঙ্গ, আয়না, পৃ. ১৩১।

৩৩ পূর্বোক্ত, পৃ, ১৩১

৩৪ ,, ,, ১৫৬

৩৫ Myron Weiner—'The Politics of South Asia' in the Politics of the developing Areas—Almond and Coleman edited, 1970, P. 185.

৩৬ ,, ,, ২৩৩

৩৭ আবুল মনসুর আহমদ, 'জনসেবা ইউনিভার্সিটি', ফুডকনফারেন্স, পৃ. ১৪১।

৩৮ পূর্বোক্ত পৃ. ১৪৬।

৩৯ আবুল মনসুর আহমদ, 'জমিদারি উচ্ছেদ' ফুডকনফারেন্স পৃ. ১২৮।

৪০ পূর্বোক্ত. পৃ. ১৩৪।

৪১ নুরুল আমিন, আবুল মনসুর আহমদের কথাসাহিত্য (চট্টগ্রাম, '৮৪) পৃ. ১২১—১২২।

৪২ আবুল মনসুর আহমদ, এ. আই. সি. সি, ফুডকনফারেন্স, পৃ. ৪২।

৪৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৪৪ ,, ,, ৫৮

৪৫ ,, ,, ৪৫-৪৬

৪৬ ,, ,, ৫৪-৫৫

৪৭ আবুল মনসুর আহমদ, রাজনৈতিক বালাশিক্ষা 'গালিভরের সফরনামা' পৃ. ১৪০।

৪৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২।

৪৯ আবুল মনসুর আহমদ 'রাজনৈতিক ব্যাকরণ' গালিভরের সফরনামা, পৃ. ১৪৮।

৫০ ওয়েনার পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০।

৫১ আবুল মনসুর আহমদ, 'চেঞ্জ অব হার্ট' গালিভরের সফরনামা, পৃ. ৯৫।

৫২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬।

৫৩ ,, ,, ১০৪।

৫৪ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্য চর্চাপ্রসঙ্গ' আবুল মনসুর আহমদ স্মরণে (ঢাকা, ১৯৮১) পৃঃ ৪৩

৫৫ পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩।

৫৬ আবুল মনসুর আহমদ, 'মডার্ণ ইবরাহিম,' গালিভরের সফরনামা, পৃঃ ১০৯।

৫৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

৫৮ ,, ,, ১১৪

৫৯ ,, ,, ১১৬-১১৭

৬০ ,, ,, ১১৮

৬১ ,, ,, ১১৮

৬২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান কৃত বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে উদ্ধৃত, (ঢাকা, ১৯৫৬) পৃ, ৪১০।

৬৩ মহীউদ্দীন আহমদ, প্রকাশকের নিবেদন, ফুড কনফারেন্স।

৬৪ আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (ঢাকা, ১৯৭৫) পৃ.২৩৭।

৬৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭

৬৬ ,, ,, ২৩৭

৬৭ ,, ,, ২৩৮—২৩৯

৬৮ B. M. Bhatia, Famines in India 1860—1965 (Asia Publishing house, 1967). P. 321

৬৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২১।

৭০ ফররুখ আহমদ 'লাশ', সাত সাগরের মাঝি (ঢাকা, ১৩৮২), পৃ. ৫৩

৭১ আবুল মনসুর আহমদ, 'ফুডকনফারেন্স,' ফুডকনফারেন্স পৃ. ১৮।

৭২ পূর্বোক্ত, পৃ. ২

৭৩ ,, ,, ১২

৭৪ ,, ,, ১৩

৭৫ আবুল মনসুর আহমদ, 'গ্রো মোর ফুড', ফুড কনফারেন্স, পৃ. ৯৭।

৭৬ আবুল মনসুর আহমদ, লঙ্গরখানা, ফুডকনফারেন্স, পৃ. ৭৪।

৭৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯-৮০।

৭৮ আবুল মনসুর আহমদ, সায়েন্টিফিক বিযিনেস, ফুডকনফারেন্স পৃ. ২৯।

৭৯ পূর্বোক্ত পৃ. ৩০

৮০ ,, ,, ৩১

৮১ ,, ,, ৫৭

৮২ ,, ,, ১৯

৮৩ ,, ,, ২৫

৮৪ ,, ,, ২৬

৮৫ ,, ,, ৩৫

৮৬ বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি—২য় খণ্ড (ঢাকা, ১৩৮২), পৃ. ৯৬-৯৭।

৮৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

৮৮ ,, ,, ১০৬

৮৯ ,, ,, ১১১

৯০ আবুল মনসুর, আহমদ 'নিমক হারাম' আসমানী পর্দা, পৃ. ১১৬

৯১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

৯২ ,, ,, ১০৩

৯৩ আবুল মনসুর আহমদ, মিছিল, ফুডকনফারেন্স, পৃ. ১১৫

৯৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

৯৫ ,, ,, ১১১—১১২

৯৬ আবুল মনসুর আহমদ, 'ট্যাক্‌শের গান গাই', আসমানী পর্দা, পৃ. ১৫৩—'৫৪

৯৭ পূর্বোক্ত পৃ. ১৫১

৯৮ ,, ,, ১৫৩

৯৯ কাজী নজরুল ইসলাম 'নারী' নজরুল রচনাবলী (২য় খণ্ড) (ঢাকা, ১৯৭৬) পৃ. ১৫

১০০ আবুল মনসুর আহমদ, 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' পৃ. ৫৮—৫৯

১০১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬

১০২ বদরুদ্দীন উমর, সাম্প্রদায়িকতা (ঢাকা, ১৯৭০), পৃ. ৫৩

১০৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

১০৪ ,, ,, ৫৪—৫৫

১০৫ রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃ. ২৫৩—২৫৪

১০৬ আবুল মনসুর আহমদ, 'গো-দেও তা কা দেশ,' আয়না, পৃ. ৪২

১০৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

১০৮ ,, ,, ৪০

১০৯ ,, ,, ৪১

১১০ ,, ,, ৪৮

১১১ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন 'আবুল মনসুর আহমদ : একটি বিপ্লবী নাম,' আবুল মনসুর আহমদ স্মরণে (ঢাকা, ৭৯) পৃ. ১

১১২ আবুল মনসুর আহমদ, 'ধর্মরাজ্য,' আয়না, পৃ. ১৬৪

১১৩ পূর্বোক্ত পৃ. ১৬৬

১১৪ ,, ,, ১৬৭

১১৫ ,, ,, ১৭০

১১৬ ,, ,, ১৭২

১১৭ ,, ,, ১৭৪

১১৮ ,, ,, ১৭৫—৭৬

১১৯ ,, ,, ১৬৪

১২০ ,, ,, ১৭২

১২১ ,, ,, ১৭৪

১২২ জোনাথন সুইফট, গালিভার্স ট্রাভেলস, (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৫) পৃ.৫৩

১২৩ আবুল মনসুর আহমদ, আত্মকথা (ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ১৬৪)

১২৪ আবুল মনসুর আহমদ, নায়েবে নবী, আয়না, পৃ. ৭৫

১২৫ পূর্বোক্ত পৃ. ৭৯

১২৬ ,, ,, ৭৯

১২৭ ,, ,, ৫৬

১২৮ ,, ,, ৫৬

১২৯ ,, ,, ৬৬

১৩০ ,, ,, ৭৫

১৩১ নুরুল আমিন, আবুল মনসুর আহমদের কথা সাহিত্য, (চট্টগ্রাম, ৮৪) পৃ, ১০৯

১৩২ আবুল মনসুর আহমদ, আত্মকথা (ঢাকা, ১৯৭৮), পৃ, ১৬৩-৬৪

১৩৩ আবুল মনসুর আহমদ, 'মোজাহেদীন,' আয়না, পৃ. ১২৬

১৩৪ পূর্বোক্ত পৃ. ১২৯

১৩৫ পূর্বোক্ত পৃ. ১২৮

১৩৬ নুরুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

১৩৭ আবুল মনসুর আহমদ, 'মোজাহেদীন,' পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

১৩৮ আবুল মনসুর আহমদ, 'আসমানী পর্দা' আসমানী পর্দা, পৃ. ৫
১৩৯ পূর্বোক্ত পৃ. ১০
১৪০ ,, ,, ১২
১৪১ ,, ,, ২০
১৪২ ,, ,, ২৩
১৪৩ ,, ,, ২৮
১৪৪ ,, ,, ৩০
১৪৫ ,, ,, ৩১
১৪৬ ,, ,, ৭—৮
১৪৭ ,, ,, ২৩
১৪৮ আবুল মনসুর আহমদ, 'শিক্ষাসংস্কার', গালিভরের সফরনামা পৃ. ২২
১৪৯ পূর্বোক্ত পৃ. ৪৪
১৫০ ,, ,, ৪৯
১৫১ ,, ,, ৫২
১৫২ ,, ,, ৪৫
১৫৩ ,, ,, ৩৯
১৫৪ আবুল মনসুর আহমদ, 'আহলে সুন্নত' আসমানী পর্দা, ৬২
১৫৫ ,, ,, ৭১
১৫৬ ,, ,, ৭৪
১৫৭ ,, ,, ৭৫
১৫৮ ,, ,, ৬৩
১৫৯ আবুল মনসুর আহমদ, আত্মকথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২
১৬০ আবুল মনসুর আহমদ, 'হুজুর কেবলা', আয়না, পৃ. ১২
১৬১ পূর্বোক্ত পৃ. ১৫
১৬২ ,, ,, ১৬
১৬৩ ,, ,, ২৫
১৬৪ ,, ,, ২৫
১৬৫ ,, ,, ২৭
১৬৬ ,, ,, ২৬
১৬৭ ,, ,, ২৭
১৬৮ ,, ,, ৪

১৬৯ আবুল মনসুর আহমদ, 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,' পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫
১৭০ 'হুজুর কেবলা,' পূর্বোক্ত পৃ. ৯
১৭১ পূর্বোক্ত পৃ. ১
১৭২ আবুল মনসুর আহমদ, 'খাজাবাবা', আসমানী পর্দা, পৃ. ৫৯
১৭৩ পূর্বোক্ত পৃ. ৪৪
১৭৪ ,, ,, ৫৫
১৭৫ ,, ,, ৫২
১৭৬ ,, ,, ৫৩ ও ৫৬
১৭৭ আত্মকথা পূর্বোক্ত পৃ. ১৮১
১৭৮ পূর্বোক্ত, ১৮১
১৭৯ আবুল মনসুর আহমদ, 'লীডরে-কওম', আয়না, পৃ. ৮১
১৮০ পূর্বোক্ত পৃ. ৮৩
১৮১ ,, ,, ৮৯
১৮২ ,, ,, ৯২
১৮৩ ,, ,, ১০১
১৮৪ ,, ,, ১০৫
১৮৫ নূরুল আমিন, পূর্বোক্ত পৃ. ১১১—১১২
১৮৬ লীডরে কওম, পূর্বোক্ত পৃ. ৮১
১৮৭ পূর্বোক্ত পৃ. ৯৪
১৮৮ ,, ,, ১০৫—১০৬
১৮৯ আবুল মনসুর আহমদ, 'গালিভরের সফরনামা', পূর্বোক্ত পৃ. ৮
১৯০ পূর্বোক্ত পৃ. ৮
১৯১ ,, ,, ১৩
১৯২ ,, ,, ১৩
১৯৩ ,, ,, ১৫
১৯৪ ,, ,, ২০
১৯৫ ,, ,, ১৩
১৯৬ ,, ,, ১৩—১৪
১৯৭ ,, ,, ১৫
১৯৮ ,, ,, ১৯—২০

১৯৯ কামরুদ্দীন আহমদ, নূরুল আমিনে উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

২০০ গালিভরের সফরনামা, পৃ. ১৬

২০১ পূর্বোক্ত পৃ. ১৭—১৮

২০২ ,, ,, ১৮—১৯

২০৩ সুইফট, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬

২০৪ গালিভরের সফরনামা, পূর্বোক্ত পৃ. ১০

২০৫ সুইফট, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬—২৭

২০৬ পূর্বোক্ত পৃ. ১১৯

২০৭ গালিভরের সফরনামা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

২০৮ পূর্বোক্ত পৃ. ১৫

২০৯ আবুল মনসুর আহমদ, 'আদুভাই' আসমানী পর্দা, পৃ. ৭৬

২১০ পূর্বোক্ত পৃ. ৭৭

২১১ ,, ,, ৮০

২১২ ,, ,, ৮৫

২১৩ ,, ,, ৮৭

২১৪ পরিমল গোস্বামী, আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়, ভূমিকা ঙ, কলকাতা (১৯৬৯)

২১৫ জেমস সাদার ল্যাণ্ড, English Satire, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৬২, পৃ. ৪

২১৬ কুডন, জে, এ, এ ডিকশনারী অব লিটারারী টার্মস, পৃ. ৫৯৯, ১৯৮২

২১৭ নজরুল ইসলাম, 'আরনার ফ্রেম,' আরনা, পূর্বোক্ত

২১৮ পূর্বোক্ত

২১৯ সাদার ল্যাণ্ড, পূর্বোক্ত পৃ. ২

২২০ পরিমল গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

২২১ সাদার ল্যাণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

২২২ সালি, অজিত কুমার ঘোষ এ উদ্ধৃত, ব্যঙ্গ সাহিত্য হাস্যরসের ধারা পৃ. ৩৬ (কলকাতা ৬৮)

২২৩ পূর্বোক্ত পৃ. ৩৬

২২৪ ,, ,, ৩৬

২২৫ ,, ,, ৩৮

২২৬ জন পামার, অজিত ঘোষ এ উদ্ধৃত পৃ. ৩৯

২২৭ নুরুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

২২৮ গালিভরের সফর নামা, পূর্বোক্ত পৃ. ১০

২২৯ 'খাজাবাবা' পূর্বোক্ত পৃ, ৫৯

২৩০ এ, আই, সি, সি, পূর্বোক্ত, পৃ, ৫১

২৩১ পূর্বোক্ত পৃ. ৫১

২৩২ ,, ,, ৫৭

২৩৩ 'বিদ্রোহী সঙ্ঘ,' পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২—১৩৩

২৩৪ সাইয়েদ আবদুল হাই, যুক্তিবিদ্যা পরিচিতি ঢাকা (১৯৮৩) পৃ. ২৪৬

২৩৫ 'ফুড কনফারেন্স,' পূর্বোক্ত' পৃ. ১২

২৩৬ 'ধর্মরাজ্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭

২৩৭ 'লঙ্গর খানা,' পূর্বোক্ত পৃ. ৬৮

২৩৮ কুডন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০০

২৩৯ সায়েন্টিফিক বিষিনেস, পূর্বোক্ত পৃ. ৩৭

২৪০ নাসিরুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ স্মরণে ৭৯

২৪১ আত্মকথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১

২৪২ পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫

২৪৩ ,, ,, ২০০

২৪৪ 'শহীদ আখন্দ,' আবুল মনসুর আহমদ, আবুল মনসুর আহমদ স্মরণে (৮২)

২৪৫ অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪-১৫

২৪৬ অরুণ মুখোপাধ্যায়, বীরবল ও বাঙলা সাহিত্য, ১৯৬৮, পৃ. ১২৩-১২৪

২৪৭ অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত পৃ. ৪১৫

২৪৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৯, ৪৬৩

২৪৯ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ শে মার্চ ১৯৭৯, ঢাকা

২৫০ কুডন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৮

পরিশিষ্ট

আবুল মনসুর আহমদের জীবন ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জন্ম ও পারিবারিক পরিবেশ

আবুল মনসুর আহমদ, ১৮৯৮ সালের সেপ্টেম্বর (বাংলা ১৩০৫ সালের ১৯ শে ভাদ্র) মাসে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার ধানীখোলা গ্রামের 'ফরাযী পরিবারে' জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর প্রপিতামহ আছর উদ্দীন ১৮২৭—২৮ সালের দিকে মওলানা সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভীর অন্যতম খলীফা মওলানা এনায়েত আলীর হাতে 'শরা কবুল' করেছিলেন এবং পিতামহের (দাদার) ভাই আশেক উল্লা প্রায় একই সময়ে সৈয়দ আহমদ শহীদের মোজাহিদ দলে ভর্তি হন। পরিবারের এ জেহাদী পরিবেশ অব্যাহত ছিল লেখকের শৈশব-কৈশোরেও। চাচা মুন্‌শী ছমিদ্দরুদ্দীনের পুঁথি পাঠেও জেহাদী মনোভাব প্রকাশ পেত :

আল্লা যদি করে ভাই লাহোরে যাইব
হুথায় শিখের সাথে জেহাদ করিব।
জিতিলে হইব গাযী মরিলে শহীদ
জানের বদলে জিন্দা রহিবে তৌহিদ।

আবুল মনসুর আহমদ শৈশবে পুঁথির সুরে ও বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হতেন।

পরিবারের সকলেই ছিলেন গোঁড়া মোহাম্মদী। হানাফীদের ঘোর শত্রু মনে করতেন। হানাফীদের 'বাহাসে' পরাজিত করবার জন্য, তাঁর চাচা 'ফেকারে মোহাম্মদী,' 'রদ্দে মোকালেদ্দীন' ও 'দুররারে মোহাম্মদী' ইত্যাদি পুস্তক কিনেছিলেন। তাঁর অভিমত ছিল হানাফীরা হিন্দুদের চাইতেও খারাপ। আবুল মনসুর শৈশবে ও কৈশোরে এ'সব 'বাহাসে' যেতেন। সেকালের মাযহাবী বিরোধকে ব্যঙ্গ করার জন্য পরবর্তীকালে তাঁর এ' অভিজ্ঞতাসমূহ কাজে লেগেছিল।

শিক্ষাজীবন

বাড়ীর মাদ্রাসায় 'ফেকায়ে মোহাম্মদী' 'রাহেনাজাত' শেখসাদীর 'পান্দে-নামা' ও 'গুলিস্তা' পাঠ শেষ করে, ১৯০৬ সালে আবুল মনসুর আহমদ পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিলেন। পাঠশালায় তিনি বোধোদয়, অঙ্কের নামতা, সরল যোগ-বিয়োগ এবং শুভঙ্করী আর্য্যা পড়েছিলেন। ১৯০৯ সালে তিনি দরিরামপুর মাইনর স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক কৈলাস চন্দ্র দে, শিক্ষামূলক নাটক লিখে আবুল মনসুর আহমদকে আদর্শ-বাদী যুবকের ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ দিতেন। কৈলাস চন্দ্র দে লেখকের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯১৩ সালে ময়মন-সিংহ শহরের মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন এবং ১৯১৭ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেছিলেন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে তিনি মোহসিন বৃত্তি লাভ করেছিলেন। গোঁড়াদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে তিনি বাঙলায় 'মিলাদ শরীফ' চালু করেছিলেন।

১৯১৯ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাস ক'রে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। দর্শনে অনার্স নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু খেলাফত ও নন্‌কো আন্দোলনে মেতে উঠে পড়াশোনা ছেড়ে দেন বলা চলে। অবশেষে গুরুজনদের পরামর্শে পরীক্ষা দিয়ে অনার্স না পেলেও গ্রাজুয়েট হন। ১৯২৯ সালে রিপন কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

একাডেমিক পড়াশোনার বাইরেও তাঁর অধ্যয়নের এলাকা ছিল বিস্তৃত। "……আমার পাঠ্য তালিকায় নাটক, নভেল, কাব্য-কবিতা, মিষ্টি-ডিকেটটিড, দর্শন, বিজ্ঞান-ইতিহাস, ভূগোল, ভাল-মন্দ, শ্লীল-অশ্লীল এমনকি স্কুল কলেজের আধুনিক পাঠ্য পুস্তকও ছিল বটে,... কিন্তু ফিলসফি, মেটাফিযিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ধর্মালোচনা (বিশেষতঃ কোরান, গীতা, বাইবেল সম্বন্ধে) প্রবন্ধই আমি বেশী পড়িয়াছি।……টয়েনবি, রাসেল ও শ'র বহু বই পড়িয়াছি। কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল আমি একাধিকবার পড়িবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। লেনিন ও মাও এর অনেকগুলি বই পড়িবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি (আত্মকথা, পৃ. ১৪৯)।

কলেজ জীবনে তিনি বাঁশী বাজানো শিখেছিলেন এবং বিভিন্ন খেলা-ধুলায়ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিলেন।

ঢাকা কলেজের এস. এম. হোষ্টেলে তিনি তৎকালীন ছাত্র (ডঃ) মোতাহের হোসেন, (অধ্যাপক) জহুরুল ইসলাম, (বিচারপতি) মোহাম্মদ ইব্রাহীম, (ডেপুটি স্পীকার মরহুম) শাহেদ আলী ও আরো অনেকের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। এ'হোষ্টেলে তাঁর বাল্যবন্ধু (সাংবাদিক) আবুল কালাম শামসুদ্দীনও ছিলেন।

ধর্মজীবন

গোঁড়া মোহাম্মদী পরিবারের সন্তান আবুল মনসুর আহমেদ গোড়ার দিকে নিজেও পাক্কা মোহাম্মদী ছিলেন। লাল তুর্কী টুপী মাথায় পরতেন এবং মোহাম্মদীদের পক্ষে তর্ক করতেন। ঘটনাচক্রে একদিন তিনি ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের শিক্ষক মৌঃ শেখ আবদুল মজিদের সংস্পর্শে আসেন। জনাব মজিদ ও জিলা স্কুলের তৎকালীন হেড মৌলভী মৌঃ আলী নেওয়ায মযহাবী-কলহের বিরোধী ছিলেন। এঁদের সাহচর্যে আবুল মনসুর আহমদ প্রথম উদারতার পাঠ নেন। তিনি হানাফীদের ভালবাসতেও শুরু করলেন। এ' উদারতা ক্রম প্রসারিত হয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁর ভালবাসা জন্মাতে সহায়তা করেছিল। ১৯১৮'—১৯ সাল থেকে তিনি কবরপূজা এবং পীর-পূজার সরাসরি বিরোধিতা করতে শুরু করেন (আত্মকথা পৃ. ১৮০—১৮১)। এমনকি এ সময় তিনি নামায-রোযাও ছেড়ে দেন। খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে কোরআন-হাদীস আবৃত্তি করতে গিয়ে পুনরায় ধর্মে 'মতি' ফিরে পান। কলকাতায় গিয়ে নতুন পরিবেশে আবার নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হন। কলকাতায় তিনি আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছাড়াও ইয়াকুব আলী চৌধুরী, ডাঃ লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, প্রমুখকে বন্ধু হিসেবে পান। এদের সকলেই বাঙলা সাহিত্যে মুক্তচিন্তার লেখক হিসেবে খ্যাত। মুসলমানদের বুদ্ধির আড়ষ্টতা ও চিন্তার অবরুদ্ধতা থেকে এরা মুক্তির পথ খুঁজছিলেন ঢাকার 'শিখা'গোষ্ঠীর মত। সওগাতকে কেন্দ্র করে সকলের সাথে আবুল মনসুরও বুদ্ধির মুক্তির জন্য কলম ধরেন। কিছু পরে মৌলবী মুজিবুর রহমান সাহেবকে সভাপতি করে তিনি, লীগ এগেনষ্ট 'মোল্লাইজম' গঠন করেছিলেন। মোল্লা খতম করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না; উদ্দেশ্য ছিল মোল্লাকি

(মোল্লাগিরি) খতম করা। মুসলমানদের পর্দাপ্রথা; বুকের ওপর ও নীচে তহরিমা বাঁধা নিয়ে ঝগড়া; জানাযার নামাযে মাইয়াতে'র বুক বরাবর বা শির বরাবর দাঁড়ানো নিয়ে মারামারি, বারো তকবীর বনাম ছয় তকবীর; জোরে বা আস্তে আমিন বলা নিয়ে মুসলমানে, মুসলমানে খুনোখুনি তাঁকে ব্যথিত করেছিল (আত্মকথা পৃ, ২২৫)। আবুল মনসুর আহমদ বিশ্বাস করতেন, এর প্রতিকার একমাত্র টলারেন্স (আত্মকথা, পৃ. ২২৫)। আবুল মনসুর আহমদ ধর্মজীবনে 'টলারেন্স' অর্জন করেছিলেন। 'টলারেন্স' অর্জনে তাঁকে সহায়তা করেছিল বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থপাঠ, বিভিন্ন উদার বন্ধুর সাহচর্য এবং সওগাতের পরিবেশ। এ পরিবেশ তাঁর 'আয়না'র জন্ম দিয়েছিল (আত্মকথা, পৃ. ২০০)। 'টলারেন্স' অথবা উদারতা অর্জন না করলে অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে 'মুজাহেদীন', নায়েবে নবীর মত শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প রচনা করা সম্ভব হত না।

সাংবাদিক জীবন

আবুল মনসুর আহমদের সাংবাদিক জীবন শুরু হয় ১৯২৩ সালে সাপ্তাহিক 'মুসলিম জগৎ' এর সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে সহযোগিতার মাধ্যমে। এরপর তিনি যথাক্রমে 'ছোলতান', 'মোহাম্মদী', 'দি মুসলমান' ও 'খাদেম' পত্রিকায় ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ করেন। সাংবাদিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৩৮ সালে তিনি দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালে তিনি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত এ, কে, ফজলুল হকের 'নবযুগে' যোগদান করেন। সাংবাদিক জীবনের শেষ পর্যায়ে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দৈনিক ইত্তেহাদের সম্পাদকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তাঁর সাংবাদিকতা সীমাবদ্ধ ছিল ইংরেজী-বাঙলা কাগজের কলামিষ্ট হিসেবে। সাংবাদিক জীবনের তিনি 'রক্তচক্ষু', 'বজ্রমুষ্টি' ইত্যাদি বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ উদ্দীপক হেডিং এবং যুক্তিপূর্ণ সম্পাদকীয় লিখে মাওলানা আকরাম খাঁ এবং অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এক সময় তাঁর ধারণা ছিল 'রাজনীতি' ও

সাংবাদিকতা সম্পূর্ণ আলাদা কাজ। নবযুগে চাকরী নিয়ে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

উকিল জীবন

১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসের দিকে অর্থাৎ সাংবাদিক জীবনের প্রথম পর্যায় শেষ করে আবুল মনসুর আহমদ ময়মনসিংহ জজকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেছিলেন। 'নবযুগের' চাকরী যাওয়ার পর তদানীন্তন বাঙলা সরকারের এসিষ্ট্যাণ্ট জুডিসিয়াল সেক্রেটারী মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতায় তিনি আলীপুরে পুনরায় আইন ব্যবসা শুরু করেছিলেন। শেষ বারের মতো ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি ময়মনসিংহে আইন ব্যবসা করেন। উকিল জীবনে তিনি 'টাউট' থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সংস্পর্শে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন। "বলা বাহুল্য, উকিল-জীবনের বিচিত্র-অভিজ্ঞতা আবুল মনসুর আহমদের কোনো কোনো সাহিত্যে প্রভাব-বলয়ের সৃষ্টি করেছে। এ-ক্ষেত্রে তাঁর 'সত্যমিথ্যা', 'আবেহায়াত' ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে (নুরুল আমিন, পৃ, ৩৫)।

রাজনৈতিক জীবন

শিখ-বিদ্বেষ ও ফিরিংগি বিদ্বেষ আবুল মনসুর আহমদের আকৈশোর ছিল। ঢাকা কলেজে পড়বার সময় ধীরে ধীরে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২০ সালে আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলনে তিনি সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯২২ সালের মাঝামাঝি জেলা কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির ওয়ার্কিং বৈঠকে যোগদান করেছিলেন। ১৯২৯ সালে মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে তিনি এবং অন্যান্য কয়েকজন মিলে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন করেন। তিনি জেলা প্রজা-সমিতির সেক্রেটারী ছিলেন। একই সময় তিনি জেলা-কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেন্টও ছিলেন। প্রজা সমিতির অধিকাংশ সদস্য মুসলমান হলেও দেশের অর্থনৈতিক গণআন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তিনি এ সংগঠনের অসাম্প্রদায়িক শ্রেণীরূপ বজায় রাখবার চেষ্টা

চালিয়েযান। ১৯৩৫ সালের দিকে আবুল মনসুর আহমদ ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগেরও সভাপতি ছিলেন। প্রজা-সমিতির সাথে মুসলিম লীগের তখনো অনেক বিষয়ে মিল ছিল না। এরপর ১৯৪০ সালের দিকে তিনি পরিপূর্ণভাবে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তিনি গণ-পরিষদের মেম্বর নির্বাচিত হয়েছিলেন। মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে এসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মৌলানা ভাসানী, আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করলে ১৯৫০ সালে আবুল মনসুর আহমদ ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যুক্তফ্রন্টের ১৯৫৪ সালের ২১ দফা সংবলিত নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টো রচনার ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল। শহীদ মিনার নির্মাণের দাবী, ২১শে ফেব্রুয়ারীকে ছুটির দিন ঘোষণার দাবী এবং তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর সরকারী বাসভবন বর্ধমান হাউসকে বাঙলা একাডেমীতে পরিণত করবার দাবী অন্তর্ভুক্ত ক'রে তিনি ২১ দফা রচনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় ১৯৫৪ সালে তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী এবং মাত্র ছয়দিন পর তিনি কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর দায়িত্বভার পেয়েছিলেন। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী'।

১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে দু'বার আবুল মনসুর আহমদকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল।

আবুল মনসুর আহমদ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' লিখেছিলেন। অর্থাৎ কমবেশী পঞ্চাশ বছর তিনি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। তিনি দেখেছেন খেলাফত অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অসংখ্য কর্মসূচী; তিনি দেখেছেন রাজনৈতিক বিরোধ-ভ্রান্তি-চক্রান্ত। এসব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রচনা করেছিলেন রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-ভুক্ত গল্প-নাট্যচিত্র সমূহ এবং গালিভরের সফরনামা।

সাহিত্যিক জীবন

আবুল মনসুর আহমদের পরিবারে বসত পঁুথিপাঠের আসর। পঠিত হত আলেফ লায়লা কাছাছুল আম্বিয়া, শহীদে কারবালা, আমির হামযা, জঙ্গনামা ইত্যাদি পঁুথিসমূহ। শৈশবের পঁুথিপাঠের আসর ও স্কুলে শিক্ষক কৈলাসদের সাহচর্য তাঁকে সাহিত্যচর্চার প্রেরণা যুগিয়েছিল। যার ফলে অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালেই মাসিক 'আল-ইসলাম' পত্রিকায় তিনি লেখা পাঠিয়েছিলেন মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শনের ওপর। এ লেখা এবং পরবর্তীকালে তাঁর আরো কিছু লেখা 'আল ইসলাম' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এরপর 'সওগাত', 'বংগীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' 'মুসলিম জগৎ' এবং পরে সারা জীবন ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর ব্যঙ্গ গল্প, ব্যঙ্গ নাট্যচিত্র, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। প্রায় সব লেখাই বিভিন্ন সময় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত ব্যঙ্গ রচনা 'ছহি বড় তৈয়বনামা'—'মুসলিম জগতে' প্রকাশিত হয়েছিল।

'সাহিত্য বা শিল্প জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—এই মতই তিনি সর্বদা দৃঢ়তার সংগে পোষণ করেছেন এবং এ বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও রচনা করেছেন। ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় 'গোলামী সাহিত্য' ১৩৩৯ সালে সওগাতে সাহিত্য ও যুগধর্ম এবং ১৯৪১ সালে চতুরঙ্গে সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে রাজনীতি, এই তিনটি প্রবন্ধে তাঁর মতাদর্শের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর বিদ্যমান' (আবুল মনসুর আহমদ স্মরণে—১৯৮১, পৃ, ৪৫)।

সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে আবুল মনসুর আহমদ অনেক গুণী কবি•সাহি•ত্যিক সাহিত্য সেবীর সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে এয়াকুব আলী চৌধুরী। ডাঃ লুৎফর রহমান, কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, এস ওয়াজেদ আলী, হুমায়ুন কবির এবং মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবুল মনসুর আহমদ স্বয়ং তাঁর সাহিত্যিক জীবনকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। 'প্রথম মুদ্দত ও কলিকাতা জীবন ১৯২২ হইতে ১৯২৯। দ্বিতীয় মুদ্দত ময়মনসিংহ জীবন ১৯৩০ হইতে ১৯৩৮। ১৯৩৮ হইতে ১৯৫০ পর্যন্ত

আমার কলিকাতার জীবন আমার সাহিত্যিক জীবনের তৃতীয় মুদ্দত। ১৯৫০ সাল হইতে আজ পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহের জীবন আমার চতুর্থ মুদ্দত (আত্মকথা, পৃ, ২৮১—২৮২)।

১৯২২ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত রচিত উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ (গল্প) 'আয়না'র অন্তর্ভুক্ত। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা 'জীবন ক্ষুধা' উপন্যাস। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত রচিত লেখাসমূহ ফুড-কনফারেন্স, 'আসমানী পর্দা' ও গালিভরের সফরনামায় ছাপা হয়েছে। 'সত্যমিথ্যা' উপন্যাস এ সময়কালে রচিত হয়। ১৯৫০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৯ সালের মধ্যে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। আগের কিছু লেখাও এ' সময় প্রকাশিত হয়েছে। এ সময় প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'আবে হায়াত' (উপন্যাস) 'পাক বাঙলার কালচার' (বাঙলাদেশের কালচার)—প্রবন্ধ সংকলন, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর'—স্মৃতি-চারণমূলক গ্রন্থ ও 'আত্মকথা'।

'বাঙলার কৃষক-প্রজা আন্দোলন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিরূপে পাকিস্তান আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়, আবুল মনসুর এর প্রথম উপন্যাস 'জীবন ক্ষুধা' তারই বিশ্লেষণ' (আবুল মনসুর আহমদ স্মরণে—৮১, পৃ. ৪৫)। 'ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামির পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে, নায়ক হামিদ কিভাবে ধীরে ধীরে আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে উদারতার মুক্ত হাওয়ায় বেরিয়ে এলো এবং নায়িকা রাযিয়ার সংগে প্রেম সাধনাকে সার্থক করে তুললো' (নুরুল আমিন, পৃ, ৭২)—এটাই আবে হায়াত উপন্যাসের মূল বিষয়। 'অন্যান্য সামাজিক সমস্যার মতো গ্রাম্য রাজনীতির সমস্যাও আমাদের জাতীয় জীবনে একটি বড় ধরনের সমস্যা, বাঙালী জীবনে এ সমস্যার প্রকট রূপটি আবুল মনসুর আহমদ 'সত্যমিথ্যার' মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। (নুরুল আমিন, পৃঃ ৮৪)।

'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছরে' স্মৃতিচারণের ভংগীতে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, 'বেংগলপ্যাক্ট' প্রজাসমিতি প্রতিষ্ঠা, প্রজা-আন্দোলন' হক মন্ত্রীসভা গঠন, পাকিস্তান আন্দোলন, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, উচ্চতর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ভূমিকা, ঐতিহাসিক মারি প্যাক্ট, ওয়ারতি জীবন,

সত্তরের সাধারণ নির্বাচন, ভুট্টো-ইয়াহিয়া ষড়যন্ত্র, শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তন' ৭১-পরবর্তী প্রশাসনিক অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। একই স্মৃতিচারণের ভংগিতে 'আত্মকথায়' তাঁর শৈশব কৈশোর, শিক্ষাজীবন, ধর্মজীবন, সাহিত্যিক জীবন, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের কালচার গ্রন্থে বাংলাদেশের মুসলমানদের ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসংগে তিনি তার নিজস্ব বক্তব্য রেখেছেন। 'খেয়ে' 'দেয়ে' 'পেরিয়ে' 'বেড়িয়ে' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের এই কথ্যরূপ ও 'হিসেব নিকেশ' হচ্ছে অনিচ্ছে ধরনের বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের এই কথ্যরূপ আমাদের লেখক সাহিত্যিকরা ব্যবহার করেন। আবুল মনসুর একে কলকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিম বাংলার ডায়ালেক্ট বলেন। তাঁর মতে ভিন্ন রাষ্ট্রের কথ্য ভাষাকে স্বাধীন সার্বভৌম আমাদের রাষ্ট্রের সাহিত্যের ভাষা করার চেষ্টা বাস্তবের দিক থেকে গণবিরোধী, আর্টের দিক থেকে কৃত্রিম, অসুন্দর ও জাতীয় মর্যাদার দিক থেকে আত্মসম্মানের হানিকর। কলকাতা কেন্দ্রিক উন্নত বাঙলা ভাষা সাহিত্যের সাথে ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলাদেশের সাহিত্যিক সম্পর্ককে আবুল মনসুর লণ্ডন কেন্দ্রিক ইংরেজী সাহিত্যের সাথে ওয়াশিংটন কেন্দ্রিক মার্কিন দেশের সাহিত্যের সম্পর্কের তুলনা করেন'। (আবুল মনসুর আহমদ স্মরণে, ৮১ পৃ. ৪৭)। বাঙলার অধিকাংশ সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদের এ' বক্তব্য মেনে না নিলেও, তিনি তাঁর বক্তব্যে অটল ছিলেন।

বাঙলা ও ইংরেজীতে রচিত অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থেও তাঁর রাজনৈতিক-সাংবাদিক অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা উত্তর চিন্তা-চেতনা সংকলিত হয়েছে।

তাঁর ব্যঙ্গ গল্প, নক্শা, ব্যঙ্গ-নাট্যচিত্রসমূহ চারটি গ্রন্থে, যেভাবে সংকলিত হয়েছে—তার পুরো তালিকা নীচে দেওয়া হল।

'আয়না'—হুজুর কেবলা, গো দেওতা কা দেশ, নায়েবে নবী, লীডরে কওম, মুজাহেদীন, বিদ্রোহী সংঘ, ধর্মরাজ্য।

'ফুডকনফারেন্স'—ফুডকনফারেন্স, সায়েন্টিফিক বিযিনেস, এ. আই. সি. সি. লঙ্গরখানা, রিলিফওয়ার্কস, গ্রো মোর ফুড, মিছিল, জমিদারি উচ্ছেদ ও জনসেবা ইউনিভার্সিটি।

'আসমানী পর্দা'—আসমানী পর্দা, ত্রিযুগমিত, খাজাবাবা, আহলে সুন্নত, আদুভাই, নিমকহারাম, ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি, ছহি বড় ওযারতনামা, ট্যাকশের গান গাই, আয় ভেস্তে কে যাবি আয়।

'গালিভরের সফরনামা'—গালিভরের সফরনামা, শিক্ষা, সংস্কার, বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে অনারেবল মিনিষ্টার, আহা। যদি প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম, চেঞ্জ অব হার্ট, 'মর্ডাণ ইব্রাহীম, ইলেকশন, রাজনৈতিক বাল্যশিক্ষা, রাজনৈতিক ব্যকরণ, অথ কুত্তা শিয়াল চরিতামৃত।

ব্যঙ্গ রচনা সমূহ বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। শুরুতে বলা হয়েছিল, ব্যঙ্গ রচনার স্রষ্টা হিসেবেই আবুল মনসুর আহমদ সমধিক পরিচিত। বস্তুতঃ তাঁর রচনা সমূহের মধ্যে ব্যঙ্গ রচনা সমূহই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার এবং তাঁর রাজনৈতিক ব্যঙ্গ রচনা সমূহ সমগ্র বাঙলা সাহিত্যেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানাতে পারে। তাঁর প্রবন্ধসমূহেও তিনি মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গ রচনায় মৌলিকতার সাথে মিশেছে সৃষ্টিশীল প্রতিভার শক্তি।

১৯৭৯ সালের ১৮ই মার্চ, আবুল মনসুর আহমদ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

বাঙলার শ্রেষ্ঠ রস সাহিত্য : একটি খসড়া

'এতভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা'। অতি সম্প্রতিকালের সাহিত্যে হাস্য-রসের উপাদান কমে আসলেও, প্রাচীন-মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের অধিকাংশ সাহিত্য হাস্যরসের সন্ধান মেলে। বাঙলার লোকসাহিত্য সম্পর্কে এ' উক্তি আরো বেশী করে সত্য। লোকজ-সৃষ্টি গম্ভীরা গানের এক বিরাট অংশ জুড়ে থাকে রঙ্গ-ব্যঙ্গ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অধিকাংশ সাহিত্যে কম করে একটি চরিত্র হলেও থাকত যার কাজ হতো রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক পরিবেশ নির্মাণ করে আসর জমানো। সে চরিত্র কখনো নিজে হাসত আর কখনো বা নিজেই হাসির পাত্র হত। এ'কথা বিভিন্ন মংগল কাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন থেকে শুরু করে যাত্রা ও কবিগান পর্যন্ত প্রযোজ্য। পরবর্তীকালে ঈশ্বর চন্দ্রগুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলাম বা আরো পরের অনেক লেখক তাদের লেখায় প্রচুর রঙ্গ-ব্যঙ্গ পরিবেশন করেছেন। প্রত্যেক সাহিত্যে যেমন বাঙলা সাহিত্যেও তেমনি কোন কোন লেখক, মূলতঃ রঙ্গ-ব্যঙ্গের লেখক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। এ'দের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, পরশুরাম, শিবরাম চক্রবর্তী, পরিমল গোস্বামী, সৈয়দ মুজতবা আলী ও আবুল মনসুর আহমদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নীচে বাঙলা সাহিত্যের হাস্যরসিক লেখকবৃন্দের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হল (মূলতঃ অজিত কুমার ঘোষের ব্যঙ্গ সাহিত্যের হাস্য রসের ধারাও, পরিমল গোস্বামীর আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয় অবলম্বনে।

লেখক	লেখার শ্রেণী	প্রকৃতি	উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ	সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য চরিত্র
রামেশ্বর ভট্টাচার্য	কবিতা	রঙ্গব্যঙ্গ	শিবায়ন	নারদ
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	,,	,,	চণ্ডীমঙ্গল	ভাড়দত্ত ও মুরারীশীল
ভারতচন্দ্র	,,	,,	অন্নদামঙ্গল	চন্দ্রমুখী, পদ্মমুখী
কৃত্তিবাস	,,	,,	রামায়ণ	কুম্ভকর্ণ
কাশীরাম দাস	,,	,,	মহাভারত	শকুনি ও কীচক
বড়ু চণ্ডীদাস	,,	রঙ্গ	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	বড়ায়ী
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	,,	রঙ্গ-ব্যঙ্গ	ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য সংগ্রহ	

লেখক	লেখার শ্রেণী	প্রকৃতি	উল্লেখযোগ্য সৃষ্ট গ্রন্থ	উল্লেখযোগ্য চরিত্র
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	সামাজিক নক্‌শা	রঙ্গব্যঙ্গ	নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস	নববাবু, নববিবি
প্যারীচাঁদ মিত্র	উপন্যাস ও নক্‌শা	,,	আলালের ঘরের দুলাল,	ঠকচাচা
কালীপ্রসন্ন সিংহ	নক্‌শা	,,	হুতোম প্যাঁচার নক্সা	প্রায় সব চরিত্র
মধুসূদন দত্ত	প্রহসন	,,	একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ	,, ,,
দীনবন্ধু মিত্র	নাটক ও প্রহসন	,,	জামাই বারিক, সধবার একাদশী,	নিমচাঁদ
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	প্রবন্ধ	,,	কমলাকান্তের দপ্তর	কমলাকান্ত
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	গল্প-উপন্যাস	রঙ্গ	কঙ্কাবতী, মুক্তমালা	তনু রায়, গুরুদেব
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কাব্য	প্যারডি	ভারত উদ্ধার	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কবিতা/নাটক/ প্রহসন/গল্প	রঙ্গব্যঙ্গ	'দুরন্ত আশা (কবিতা) 'চিরকুমার সভা তোতাকাহিনী'	বহু চরিত্র
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	উপন্যাস	,,	শ্রীকান্ত ও অন্যান্য উপন্যাস	টগর বোষ্টমী, রাসবিহারী
প্রমথ চৌধুরী	প্রবন্ধ/গল্প	,,	নীল লোহিত, বার ইয়ারি কথা	ঘোষাল, নীল লোহিত

লেখক	লেখার শ্রেণী	প্রকৃতি	উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ	সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য চরিত্র
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	কবিতা/নাটক	রঙ্গব্যঙ্গ	হাসির গান, আষাঢ়ে,	দিলদার
সজনীকান্ত দাস	কবিতা	প্যারডি	ভাণ্ডারী হুঁশিয়ারি	
পরশুরাম	গল্প	রঙ্গব্যঙ্গ	গড্ডালিকা, জাবালি	অনেক চরিত্র
নজরুল ইসলাম	কবিতা	,,	চক্রবিন্দু	
আবুল মনসুর আহমদ	গল্প	ব্যঙ্গ	আয়না, ফুডকনফারেন্স	,,
শিবরাম চক্রবর্তী	,,	,,	প্রায় সব গ্রন্থ	,,
সৈয়দ মুজতবা আলী	রম্য রচনা উপন্যাস	রঙ্গব্যঙ্গ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী	

সহায়ক রচনাপঞ্জী

আকর গ্রন্থ (লেখকের নাম অনুসারে)

আবুল মনসুর আহমদ : আয়না। সপ্তম সংস্করণ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৭৮।

: আসমানী পর্দা। দ্বিতীয় সংস্করণ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৭১।

: ফুড কনফারেন্স। তৃতীয় সংস্করণ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা ১৩৭৮।

: গালিভরের সফর নামা। তৃতীয় সংস্করণ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৭৮।

সহায়ক গ্রন্থ (লেখকের নাম অনুসারে)

অজিত কুমার ঘোষ : বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা। দ্বিতীয় সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ১৯৬৮।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : বীরবল ও বাঙলা সাহিত্য। দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৬৮।

আনিসুজ্জামান : মুসলিম মানস ও বাঙলা সাহিত্য। লেখক সঙ্ঘ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৪।

আবুল কাশেম চৌধুরী : বাঙলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

আবুল মনসুর আহমদ : আত্মকথা। খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৭৮।

: আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর। নওরোজ কিতাবিস্তান, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৭৫।

: বাংলাদেশের কালচার। আহমদ পাবলিশিং হাউজ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা,১৯৭৬।

কাজী নজরুল ইসলাম : নজরুল রচনাবলী (২য় খণ্ড)। কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৭

কুমারেশ ঘোষ (সম্পাদনা) : সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা। গ্রন্থগৃহ, কলিকাতা, ১৯৬৫।

নুরুল আমিন : আবুল মনসুর আহমদের কথাসাহিত্য। অগ্রণী প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৮৪।

পরিমল গোস্বামী : আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়। নবগ্রন্থনা, কলিকাতা, ১৯৬৯।

বদরুদ্দীন উমর : পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (২য় খণ্ড), ঢাকা, ১৩৮২।

: সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকা, ১৯৭০।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে। এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৭২।

মুহম্মদ আবদুল হাই : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৫৬।

সৈয়দ আলী আহসান

মাহবুবুল আলম (সম্পাদিত) : বাংলা প্যারডি কবিতা। খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং ঢাকা, ১৩৭৬।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭৮।

সাইয়েদ আবদুল হাই : যুক্তিবিদ্যা পরিচিতি (আরোহ), ঢাকা, ১৯৮৩

সহায়ক প্রবন্ধ (লেখকের নাম অনুসারে)

মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন : আবুল মনসুর আহমদ: একটি বিপ্লবী নাম। আবুল মনসুর আহমদ স্মরণে, ঢাকা, ১৯৭৯

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে, আবুল মনসুর আহমদ স্মরণে, ঢাকা, ১৯৮১

রফিকুল ইসলাম : ২১-দফার প্রণেতা আবুল মনসুর আহমদ।

: আবুল মনসুর আহমদ স্মরণে, ঢাকা, ১৯৮১

শহীদ আখন্দ : আবুল মনসুর আহমদ, আবুল মনসুর আহমদ স্মরণে ঢাকা, ১৯৮২

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : আবুল মনসুর আহমদ, আবুল মনসুর আহমদ স্মরণে, ঢাকা, ১৯৮১

সহায়ক ইংরেজী গ্রন্থ (লেখকের নাম অনুসারে)

Bhatia, B. M. : Famines in India 1860 1965, Asia Publishing house, India, 1967.

Cuddon, J. A. : A dictionary of history terms. Penguin books, U, S, A, 1982.

Orwell. George. : Animal farm, Penguin books, 1966.

Weiner, Myron. : The Politics of South Asia in the politics of the developing areas Almond and Coleman edited, 1970.

Sutherland, James : English Satire. Cambridge University Press, 1962.

Swift, Jonathon : Gulliver's Travels. Oxford University Press, 1965.

নির্ঘণ্ট

অ

অজিত কুমার ঘোষ ২, ৯৯, ১০৩

'অথ কুত্তাশিয়াল চরিতামৃত' ৩, ৬, ৭, ৯, ৬৮, ৭০, ৯৮

'অনারেবল মিনিষ্টার' ৪, ৯৮

অন্নদামঙ্গল ৯৯

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ১০৩

অসহযোগ আন্দোলন ৫, ৫২, ৯৬

আ

আওয়ামী মুসলিম লীগ ৯৪

আওয়ামী লীগ ৯৬

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ২৭

আছর উদ্দীন ৮৯

'আত্মকথা' ১, ২, ৩, ১০৩

'আদু ভাই ৪, ৫৭, ৬৩, ৬৪, ৯৭

'আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়' ১০০, ১০৩

আনন্দবাজার ৩৪, ৩৫

আনিসুজ্জমান ১০৩

আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম ১৬

আবুল কালাম শামসুদ্দিন ২, ৩, ৯১, ৯২, ৯৫

আবুল কাশেম চৌধুরী ১০৩

'আবুল মনসুর আহমদের কথা সাহিত্য ১, ১০৩

আবুল হাসনাত ১

আব্দুল করিম গজনভী ১, ৩৩

আবদুল্লাহ ৪৯

'আবে হায়াত' ১, ৯৬

আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ১, ২২, ৯৪, ৯৬, ১০৩

আমির হামযা ৯৫

আলালের ঘরের দুলাল ১০০

আল ইসলাম ৯৫

আল কোরানের নছিহত ১

আলী নেওয়াজ ৯১

আলেফ লায়লা ৯৫

আশেক উল্লা ৮৯

'আষাঢ়ে' ১০১

'আসমানী পর্দা ১, ৪ ৪৩, ৪৪, ৭০, ৯৬, ৯৭, ১০৩

'আহা যদি প্রধান মন্ত্রী হতে পারতাম' ৪, ১৯, ৯৮

আহলে সুন্নত ৪৭, ৪৮, ৯৭

'আয়না' ১, ২, ৩, ৭৫, ৭৬, ৯৫, ৯৭, ১০১, ১০৩

আয়নুল হক ৩

'আয়, বেহেস্তে কে যাবি আয়' ৩, ৯৭

ই

'ইওনিটি ইন ডাইভার্সিটি' ৩, ১০, ৯৭
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০
ইত্তেহাদ ৯২
'ইলেকশান' ৪, ১৭, ১৮
ইয়াকুব আলী চৌধুরী ৯৫

ঈ

ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত ৯৯, ১০০
'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যসংগ্রহ' ৯৯

এ

'এ,আই সি, সি' ৪, ১৪, ১৫, ১৬ ৯৭
'একেই কি বলে সভ্যতা !' ১০০
এ, কে ফজলুল হক (শেরে বাংলা) ২৩, ২৪, ৯২
এন, এম, হুদা ৩১
এনায়েত আলী ৮৯
'এনিমাল ফার্ম' ৭, ২৪
এস, ওয়াজেদ আলী ৭৪,৯৫

ক

'কঙ্কাবতী' ১০০
কংগ্রেস ৫, ১০, ১৪
কংগ্রেস-খেলাফত আন্দোলন ৩৬
'কমলাকান্তের দপ্তর' ১০০
'কাছাসুল আম্বিয়া' ৯৫
কাজী আবদুল ওদুদ ৭৪
কাজী এমদাদুল হক ৪৯
কাজী মোতাহার হোসেন ৯১, ৯৪
কাশীরাম দাস ৯৯
কালীপ্রসন্ন সিংহ ১০০
কুমারেশ ঘোষ ১০৩
কৃত্তিবাস ৯৮
কৃষক প্রজাপার্টি ১৪
কে. পি. চট্টোপাধ্যায় ২২
'ক্যাপিটাল' ৯০
কার্ল মার্কস ৯০

খ

খাজা নাজিমুদ্দিন ৮, ২২, ২৪
'খাজাবাবা ৪, ৪৯' ৫৩, ৭৬, ৯৭
খাজা মইনুদ্দীন চিশতী ৪৯, ৫২
'খাদেম ৯২
খেলাফত আন্দোলন ৫, ৪১, ৫৫, ৯১, ৯৬

গ

'গড্ডালিকা' ১০১
'গালিভার্স ট্রাভেল্‌স' ৪, ২৬, ৩৪, ৩৮, ৬২
'গালিভরের সফরনামা' ১, ৪, ৬, ৫৭, ৫৮, ৬১, ৬৩, ৬৮, ৬৯, ৭৩, ৯৬, ৯৯, ১০৩
'গো দেওতা কা দেশ' ৪, ৩৪, ৩৬, ৩৯, ৭০, ৭৩ ৯৭
গোরক্ষা কমিটি ২৭
'গ্রো মোর ফুড' ৪, ২৩, ২৫, ৯৭

চ

'চণ্ডীমঙ্গল' ৯৯

'চন্দ্রবিন্দু' ১০১

চর্যাপদ ২

'চিরকুমার সভা' ১০০

'চেঞ্জ অব হার্ট' ১৭, ১৮, ৯৮

ছ

'ছহিবড় ওয়ারত নামা' ৩, ৮, ৯, ৬৯, ৯৭

'ছহিবড় খাবনামা, ২

'ছহিবড় তৈয়বনামা', ২

'ছহিবড় সোনাভান' ১, ৯

'ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া' ১

'ছোলতান' ৯২

জ

'জঙ্গনামা' ৯৫

'জনসেবা ইউনিভার্সিটি' ৪, ১২, ১৩, ১৭, ৯৭

'জমিদারী উচ্ছেদ' ১৩, ১৪, ১৭, ৯৭

জহুরুল ইসলাম ৯১

জর্জ ওরওয়েল ৭, ২৪

জর্জ বার্ণার্ড শ' ৩

জয়নুল আবেদীন ২৩

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ৬

'জামাই বারিক' ১০০

'জীবন ক্ষুধা' ১, ৯৬

জোনাথান সুইফ্‌ট ৪, ২৬, ৩৪, ৩৮, ৫৮, ৭২, ৭৫

ট

'টাক্‌সের গান গাই' ৩, ৩১, ৯৭

ড

ডাঃ লুৎফর রহমান ৭৪, ৯১, ৯৫

ঢ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৯

ত

তিতুমীর ১

ত্রিযুসমিতি ৩, ৯, ৯৭

তৈয়বউদ্দিন আহমেদ ২

ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় ১০০

'তোতাকহিনী' ১০০

দ

'দি মুসলমান' ৯২

দ্বিজাতিতত্ত্ব ৫

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২২, ৩০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১০১

দীনবন্ধু মিত্র ১০০

'দুরন্ত আশা' ১০০

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ২, ৫

ধ

ধর্মব্যবসায় ৪৮

'ধর্মরাজ্য' ১, ৩, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৭০, ৯৭

ন

নজরুল ইসলাম, কাজী ২, ৩, ৩১, ৩৭, ৬৬, ৬৯, ৭৪, ৯২, ৯৫, ১০১, ১০৩

'নজরুল রচনাবলী' ১০৩

'নববাবু বিলাস' ১০০

'নববিবি বিলাস' ১০০

'নবযুগ' ৯২, ৯৩

নলিনীরঞ্জন সরকার ৭৩

'নারী' ৩১

'নায়েবে নবী' ৪, ৩৯ ৪০, ৪১, ৯২, ৯৭

নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি ৯৩

'নিমক হারাম' ২৯, ৯৭

নীল লোহিত ১০০

নুরুল আমিন ১, ৯৩, ৯৬, ১০৩

নূরুল আমিন (মন্ত্রী) ১৪ ৬০ ৬১

প

পরশুরাম ৭৪, ৭৫, ৯৯, ১০১

পরিমল গোস্বামী ১০০, ১০৩

'পাক-বাঙলার কালচার' ১, ৭২, ৯৬

'পাক-বাঙলার ভাষা' ৭২

পাকিস্তানের লবন সংকট ২২

'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎ-কালীন রাজনীতি, ১০৩

প্যারীচাঁদ মিত্র ১০০

প্রজাসমিতি ৯৬

প্রমথ চৌধুরী ৭৪, ৯৯, ১০০

ফ

ফররুখ আহমদ ২৩

'ফুড কন্‌ফারেন্স, ১, ২৩, ৩০, ৭০, ৭৫, ৯৬, ৯৭, ১০১, ১০৩

ব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০০

বঙ্গভঙ্গ ৫

'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ৯৫

'বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা' ২, ৯৯, ১০৩

বদরুদ্দীন উমর ১০৩

বন্দে মাতরম ১০

'বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে' ১৭, ১৮, ৯৮

বড়ুচণ্ডী দাস ৯৯

'বাংলাদেশের কালচার ১০৩

'বাংলা প্যারডি কবিতা' ১০৩

'বাংলাদেশের সং প্রসঙ্গে' ১০৩

'বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা' ১০৩

'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত১০৩

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা' ১০৩

'চার ইয়ারী কথা' ১০০

'বিদ্রোহী' ৬৯

বিদ্রোহী সঙ্ঘ ৪, ১০, ৬৯, ৯৭

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৩
'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ১০০
বেঙ্গল প্যাক্ট ৫, ৭, ৯৬
বেশী দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা' ১

ভ

ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০
ভাণ্ডারী হুশিয়ার ১০১
ভারত চন্দ্র ৯৯
ভারত বিভক্তি ৩৪
'ভারত উদ্ধার' ১০০
ভাষা আন্দোলন ৪৬

ম

মঙ্গল কাব্য ১০০
মধুসূদন দত্ত ১০০
'মডার্ণ ইব্রাহীম, ৪, ২১, ৩০, ৭২, ৯৮
মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড' পরিকল্পনা সংস্কার ৫
মহাভারত ৯৯
মহাত্মা গান্ধী ১৬
মাওলানা আকরাম খাঁ ৯২, ৯৩
মাও সেতুং ৯০
'মা-খাকী' ১
মাযহাবী বিরোধ ৩৯, ৫৬
মাহবুবুল হক ১০৩
'মিছিল' ৩০, ৯৭
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ৯৯
'মুজাহেদীন' ৪, ৩৯, ৪১, ৪২, ৯২, ৯৭
'মুসলমানী কথা' ১
'মুসলিম জগৎ' ৯২ ৯৬
'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' ১০৩
মুসলিম লীগ ৫, ৯, ১৪, ৩৩, ৬০, ৯৪
মুহম্মদ আবদুল হাই ১০৩
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৬
মোহাম্মদ ইব্রাহীম ৯১
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ৭৪, ৯১, ৯৫
মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন ৯৫, ১০৩
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯, ১০৩
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম ৯৩
'মোহাম্মদী' ৯২
মৌলবী মুজিবর রহমান ৯১

য

যুক্তফ্রন্ট ৯৪
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ৭৬
'যৌনবিজ্ঞান' ১

র

রফিকুল ইসলাম ১০৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১, ৫৭, ৭০, ১০০
রাজশেখর বসু ৭৪
'রাজনৈতিক বাল্যশিক্ষা ৯৮

'রাজনৈতিক ব্যাকরণ ৯৮
রামায়ণ ৯৯
'রামেশ্বর ভট্টাচার্য ৮৯
'রিলিফ ওয়ার্কস ৪, ২৩, ৯৭

ল

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস ৫
লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট ৭
'লঙ্গরখানা ৪, ২৭
লবন সংকট ২৮, ২৯
'লাশ ২৩
লাহোর প্রস্তাব ২০
লেনিন, ভি. আই ৯০
লীগ কংগ্রেস মৈত্রী ৫
লীগ ম্যানিফেস্টো ১৭
'লীডরে কওম ৪, ২৩, ৪৯, ৫৬, ৯৭

শ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০০
শহীদ আখন্দ ৭৪
শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৯২
'শহীদে কারবালা' ৯৫
'শিক্ষা সংস্কার ৪, ৪৫, ৭০, ৯৮
শিক্ষা গোষ্ঠী ৯১
শিবরাম চক্রবর্তী ১০০
শেখ আবদুল মজিদ ৯১
শেখ মুজিবর রহমান (বঙ্গবন্ধু) ৯৬
'শ্রীকান্ত' ১০০
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১০০

স

সওগাত ২, ৭৪, ৯১, ৯৫
সজনীকান্ত দাশ ১০১
'সত্যমিথ্যা ১, ৯৬
'সধবার একাদশী' ১০০
'সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা' ১০৩
'সাম্প্রদায়িকতা' ১০৩
'সায়েন্টিফিক বিযনেস' ৪, ২৩, ২৬, ৭২, ৭৩, ৯৭
সাইয়েদ আবদুল হাই ১০৩
সৈয়দ আলী আহসান ১০৩
সৈয়দ আহমদ শাহ বেরলভী ৮৯
সৈয়দ মুজতবা আলী ৯৯, ১০১
'সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাবলী ১০১
স্বরাজ ১১
স্বাধীনতা ৬

হ

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা' ৩০
হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ১০
'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ ৩৭
হিন্দু সভা ২৭
'হুজুর কেবলা ৪, ৪৯, ৫০, ৫১, ৭১, ৭৫, ৯৭
'হুতুম পেঁচার নকশা ১০০
হুমায়ুন কবির ৯৫